স্বামী শিবময়ানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ
হাওড়া - ৭১১২০২

প্রকাশক :
স্বামী স্মরণানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া – ৭১১২০২

২৩ জুন ২০২১
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : ২০ টাকা

মুদ্রক :
সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩, কে পি কুমার স্ট্রীট
বালি, হাওড়া – ৭১১২০১

স্বামী শিবময়ানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম রণেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর জন্ম বিহারের সাহরসা জেলার (বর্তমানে সুপৌল জেলা) সুপৌল শহরে ধন্বন্তরি গোত্রের এক বৈদ্যব্রাহ্মণ বংশে। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, ২০ ডিসেম্বর ১৯৩৪; ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ, পূর্ণিমা তিথি। তাঁদের পূর্বপুরুষের বাস বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা ডিভিশনের মূলঘরে। মহারাজের ঠাকুরদা চন্দ্রকান্ত সেন সরকারি চাকরির সুবাদে মূলঘর থেকে সুপৌলে এসে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি একটি কালীবাড়িও প্রতিষ্ঠা করেন।

রণেন্দ্রনাথের বাবা জিতেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন পেশায় ডাক্তার। সুপৌল ও নিকটবর্তী কয়েকটি এলাকায় চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর এগারোটি সন্তান – ছয় ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। রণেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর নবম সন্তান – ভাইদের মধ্যে পঞ্চম। তাঁর ঠাকুরদা কাশীবাস করার জন্য কাশীর অগস্ত্যকুণ্ডে 'চন্দ্রভিলা' নামে একটি বাড়ী কিনেছিলেন। ১৯৪১ সালে জিতেন্দ্রনাথ সপরিবারে বাবার সঙ্গে কাশীতে এসে বাস করতে থাকেন। ১৯৪৫ সালে বাবা জিতেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মা চারুবালা দেবী সন্তানদের নিয়ে কাশীতেই থেকে যান।

পাড়ার 'এডুকেশন অ্যাকাডেমি' নামক স্কুলে রণেন্দ্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে কাশীর বিখ্যাত 'চিন্তামণি মুখার্জী আংলো-বেঙ্গলি কলেজিয়েট স্কুল'-এ ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি উত্তরপ্রদেশ বোর্ডের উচ্চমাধ্যমিক (বর্তমানে মাধ্যমিক) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন ১৯৫২ সালে। ১৯৫৪ সালে কাশীতে কামাচ্ছা অঞ্চলে অবস্থিত সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে আইএসসি (বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দ্বিতীয় বিভাগে। এরপর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে বিজ্ঞান ও গণিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতক ও ১৯৫৯ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই গণিতে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন প্রথম শ্রেণীতে।

তিনি ছাত্র হিসাবে বরাবরই মেধাবী ছিলেন। ইন্টারমিডিয়েটে ডিস্টিংশন পান বাংলায়, স্নাতকোত্তরে কলাবিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন। তাঁর প্রতিভায় আস্থাশীল ছিলেন তাঁর অধ্যাপকরাও। পরবর্তীতে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার ছিলেন তাঁর সমকালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ছাত্র, যাঁর বাবা ডাঃ বিষ্ণু বাসুদেব নার্লিকার তখন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। রণেনের স্নাতকোত্তরের মার্কশীট আনতে গেলে অধ্যাপক নার্লিকার সাহেব তাঁকে গণিতে গবেষণা বিভাগে অবিলম্বে ভর্তি হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরেও ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত অধ্যয়নে খুশী হতেন তাঁর উপনিষদের আচার্য – তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক ও পরে দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ। শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভূতেশানন্দজী পরবর্তীকালে বলতেন, 'তোমরা রণেনকে চেন? রণেন আমার এত বুদ্ধিমান ছাত্র, ওকে কঠোপনিষদের পরীক্ষায় একশোয় একশো দিতে হত।'

বিহারের পূর্ণিয়াতে থাকতেন মহারাজের এক পিসিমা – নাম মণি-পিসীমা। তিনি মাঝে মাঝেই আসতেন কাশীতে অগস্ত্যকুণ্ডের বাড়ীতে। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। ১৯৪৯ সাল থেকে তাঁর 'চলনদার' হিসাবেই কিশোর রণেন যাতায়াত আরম্ভ করেন কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে। সেখানে তখন ছিলেন শ্রীশ্রীমা, রাজা মহারাজ অথবা মহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অনেক প্রাচীন সাধুরা। তখন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দ মহারাজ – শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও মহাপুরুষ মহারাজের সেবক। রণেন আরও সঙ্গ করেছিলেন মহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ও মাষ্টারমহাশয় 'শ্রীম'-র ঘনিষ্ঠ সাহচর্যধন্য স্বামী ধর্মেশানন্দজী (ধীরেন মহারাজ), মহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ও বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন মন্দিরের পূজারী স্বামী জ্ঞানদানন্দজী (নীলকণ্ঠ মহারাজ), শ্রীমা সারদাদেবীর সেবক ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-র সঙ্কলক স্বামী অরূপানন্দজী (রাসবিহারী মহারাজ) প্রমুখ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের।

ক্রমে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে যাতায়াত বাড়তে লাগল কিশোর রণেনের। মাঝেমধ্যেই ছুটির দিনে চলে আসেন অদ্বৈত আশ্রমে সাধুদের কাছে, গল্প করেন। স্বামী ধর্মেশানন্দ তখন অদ্বৈত আশ্রমের গ্রন্থাগারটি দেখাশোনা করতেন – দুর্গামণ্ডপের লাগোয়া দক্ষিণপূর্বের ঘরটি তখন লাইব্রেরি। সেখানে ছিল অনেক বহুমূল্য গ্রন্থ। ধর্মেশানন্দজী রণেনকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি কিশোর রণেনকে আস্তে আস্তে অফিসের কাজ ও গ্রন্থাগারের খাতা লেখার কাজ দিতে শুরু করেন। গ্রন্থাগারের উইয়ে-কাটা ও জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়া বইগুলিকে পরিষ্কার করা হয়েছে। রণেন নতুন খাতায় সেগুলির নাম তুলে রাখতে লাগলেন স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে। তাঁর হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। সেসময় কখনো কখনো নীলকণ্ঠ মহারাজের কাছেও যেতেন। গিয়ে আব্দার করে বলতেন, 'মহারাজ, খিদে পেয়েছে, খেতে দিন।' নীলকণ্ঠ মহারাজ তাঁকে কখনো একটা পেয়ারা, কখনো একটা সন্দেশ এইসব দিতেন।

সংস্কারবান তরুণ রণেনকে দেখে রাসবিহারী মহারাজও স্নেহ করতেন। দুপুরবেলা বসে অদ্বৈত আশ্রমের কাজগুলি করতেন তরুণ রণেন। ধর্মেশানন্দজীর কাছে খাতা লেখার কাজ করেন দেখে একদিন রাসবিহারী মহারাজ তাঁর স্বভাবসুলভ বাঙাল ভাষায় তাকে বললেন, 'কলেজের পড়াশুনা কিসু করো, নাকি কেবল খাতাই লিখো?' মৃদু হেসে রণেন বললেন, 'না, না, পড়াশুনাও করি।'

-- প্রসাদ পাইস?

-- হ্যাঁ, পেয়েছি।

-- ধরো, এই পানটা লও।

রণেন তো অবাক! ছেলেমানুষ বলে বড়োরা কেউই তাদের পান খেতে দেয় না। উনি পান দিয়ে বললেন, 'খাও খাও। আমাদের মা ঠাকরুন খাওনের পর একটা কইরা পান হাতে দিয়া কইতেন, "ছেলেরা আমার সামনে পান খাইলে আমার খুব আনন্দ"।' মহারাজ বলতেন, অরূপানন্দজী মহারাজ তাঁকে মায়ের এই কথাটি বলে পান খাওয়ার অভ্যাস ধরিয়েছিলেন।

সেসময় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ শেষজীবনটা কাশীতেই কাটাবেন সিদ্ধান্ত নিয়ে কাশী সেবাশ্রমে বাস করছিলেন। সেখানেই দীক্ষাদি দিতেন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তরুণ রণেন অদ্বৈত আশ্রমের নানা অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতেন, বিশেষ করে দুর্গাপূজার পাঁচ-ছ'দিন ও কালীপূজার সময় আশ্রমে রাত্রিবাসও করতেন, পূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতেন। তাই অদ্বৈত আশ্রমে ১৯৫২ সাল থেকেই তাঁর বিশুদ্ধানন্দজীকে দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল; বিশেষ করে দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময় পর পর কয়েক বছর মহারাজকে পূজা চলাকালীন দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যানস্থ থাকতে দেখেছিলেন। বিশুদ্ধানন্দজীর জপ-ধ্যানপরায়ণতা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ১৯৫৬ সালের ২৬ অক্টোবর স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের কাছে তাঁর দীক্ষা হয়। পরবর্তীকালে শিবময়ানন্দজী দীক্ষা-প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন, 'সে-সময় পূজনীয় রাসবিহারী মহারাজ আমায় বলেন, "(বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে) দীক্ষাটা নিয়া নে।" আমি জিজ্ঞাসা করি, "ইনি কি ব্রহ্মজ্ঞ?" তিনি উত্তরে বলেন, "ব্রহ্মজ্ঞ-ট্রহ্মজ্ঞ রাখিয়া দে, এইখানে দীক্ষাটা নিলে ভেজাল পাবি না।" মায়ের সেবক রাসবিহারী মহারাজ, স্বামী অরূপানন্দজী "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" – দুই খণ্ডের সম্পাদক, সারা জীবন পূর্ব বাংলার ভাষাতেই কথা বলতেন।'

এই রাসবিহারী মহারাজের আরেকটি স্মৃতি শিবময়ানন্দজী শেষ জীবন অবধি বলতেন। একদিন রণেন দেখেন যে অদ্বৈত আশ্রমের প্রাঙ্গণে বড় জাম গাছটির তলায় খাটিয়ায় বসে রাসবিহারী মহারাজ রেডিও শুনছেন। রণেন তাঁকে বলেন, 'আপনি সাধু হয়ে কোথায় জপধ্যান করবেন, তা না রেডিও শুনছেন?' উত্তরে রাসবিহারী মহারাজ বলেন, 'আরে, আমি তো আর লুকায়্যা কিছু করছি না।' এই খোলামেলা ভাবের শিক্ষাটি চিরকাল মহারাজের মনে ছিল এবং তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল।

এরই মধ্যে তাঁর মনে বৈরাগ্যের শিখা জ্বলে উঠেছিল। রণেন তখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তাঁর গুরুর কাছে অনুমতি নিতে গেলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী তাঁকে একটি চিঠি লিখে দেন সারগাছিতে শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজের নামে এবং তাঁর কাছেই যোগ দিতে বলেন। রণেন ট্রেন ধরে সোজা হাওড়া এসে দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে বেলুড় মঠে চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডটি। তাঁর দাদাকে রণেন আসার আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কথামৃতের কোন খণ্ডটি হারিয়ে গেলে তাঁর মনে সবচাইতে কম কষ্ট হবে? দাদা ভেবেচিন্তে বলেছিলেন -- পঞ্চম খণ্ডটি। সেটিই রণেন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। একটি পোস্টকার্ডে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মায়ের নামে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন।

রণেন বেলুড় মঠে আসেন ১১ জুলাই ১৯৫৯। ভিজিটার্স রুমে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়। সে সময় তিনি সবজি কোটা, স্বামীজীর মন্দির পরিষ্কার ও পূজার বাসন ধোয়া ইত্যাদি কাজগুলি করতেন। তাঁকে সারগাছি আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি সারগাছিতে আসেন ঐ বছরেরই ২৯ জুলাই। সঙ্ঘের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী জানিয়েছেন, 'আমি জুন-জুলাই মাসে একদিন সারগাছিতে প্রেমেশ মহারাজের কাছে গেছি – দেখি একটি সুন্দর ছেলে বিনোদ কুটিরের ওদিকে থাকে

– কাছা দেওয়া ধুতি, নীল জামা পরা। আমি প্রেমেশ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ, এটি কে?" মহারাজ বললেন, "সে এক মজার ঘটনা। এই ছেলেটি কাশীতে ছিল। কাশী থেকে জিতেন মহারাজ (বিশুদ্ধানন্দজী) ওকে যোগদান করতে উৎসাহিত করেন ও হাতে একটা চিঠি দিয়ে বেলুড় মঠে পাঠান। ... জিতেন মহারাজ আমাকে একটি চিঠি দিয়েছেন যে এই ছেলেটি সাধু হতে চায়। একে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।" প্রেমেশানন্দ মহারাজকে চিঠিতে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ লিখেছিলেন, "এই ছেলেটি কাশীর ছেলে – লেখাপড়ায় ভাল, স্বভাব চরিত্রও খুব ভাল। একে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি আপনার সেবার জন্য। এতে এর আহার আর ওষুধ দুইই হবে।" তখন প্রেমেশানন্দজীর সেবায় পুরোপুরি যুক্ত হয়েছেন ব্রহ্মচারী সনাতন (বর্তমানে স্বামী সুহিতানন্দজী)। তাই রণেনকে দেখিয়ে সারগাছির অধ্যক্ষ স্বামী সুখদানন্দজীকে ডেকে প্রেমেশ মহারাজ বললেন, "একে তোমার স্কুলে নিয়ে নাও। খুব কাজে লাগবে।" সুখদানন্দ মহারাজও খুশী হলেন।' বিশুদ্ধানন্দজী মর্ত্যদেহে থাকতে মাঝে মাঝে ব্রহ্মচারী রণেনের খোঁজ নিতেন। সেই থেকে ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তিনি সারগাছি বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়েই ছিলেন এবং এর প্রধানশিক্ষকও হয়েছিলেন। অবশ্য মাঝে এক বছর বি টি পড়তে ও দু' বছর ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছিলেন। সারগাছি থাকাকালীন তিনি স্কুল-প্রশাসন, শিক্ষকতা ছাড়াও পূজাও শিখেছিলেন।

এর মধ্যে অবশ্য তিনি স্বামী প্রেমেশানন্দজীর অন্যরকমভাবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রেমেশ মহারাজ তখন বৃদ্ধ ও অসুস্থ। রাত্রে একজন সেবক তাঁর কাছে থাকার প্রয়োজন হত। দু-একজন পালা করে রাত জাগতেন। স্কুলের দায়িত্ব শেষ করে রাত-জাগার দলে এসে জুটতেন ব্রহ্মচারী রণেনও। অন্য সেবকটি তখন পাশের ঢাকা বারান্দায় বিশ্রাম নিয়ে নিতেন। তাঁর পালা শেষ হলে রণেন মহারাজ অন্য সেবকটির কাছে এসে বলতেন, 'এবার আপনি হাত-মুখ ধুয়ে মহারাজের কাছে যান।'

সারগাছিতে থাকাকালীন স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারী রণেন একটি বিশেষ কাজ করেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সমসাময়িক যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অখণ্ডানন্দজীর সম্পর্কে বহু অপ্রকাশিত স্মৃতি ও তথ্য সংকলন করে 'অঞ্জলি' নামক স্মারকপত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই প্রাচীন ঐতিহ্যরক্ষার অভ্যাসের ফলেই আরও পরবর্তীকালে তিনি বৃদ্ধ ও প্রয়াত সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের জীবনী, স্মৃতি-সহ তথ্য সঙ্কলনে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং দু-একজন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকে ঐকাজে নিযুক্ত করেন। শেষদিন পর্যন্ত ঐগুলিকে পুস্তকাকারে রূপ দেবার চেষ্টায় ছিলেন।

রণেন মহারাজ তাঁর প্রত্যেক ছাত্রকে গভীরভাবে বুঝতেন। কেবল শিক্ষক হিসেবেই নয়, ক্লাসের বাইরেও তাঁর কাছে ছাত্রদের ছিল অবাধ যাতায়াতের সুযোগ একজন প্রকৃত বন্ধু ও পরামর্শদাতা হিসেবে। সারগাছি থেকে চলে আসার পরেও সময় সুযোগ পেলেই সেখানে যেতেন। সেখানে স্বামী সুখদানন্দজী, অনাময়ানন্দজী থেকে আরম্ভ করে সকলেরই তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রাক্তন ছাত্ররা অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, মহারাজও সকলের খোঁজ খবর নিতেন।

মহারাজ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। সারগাছি স্কুলের তাঁর এক ছাত্র বলেন, 'জীবনে যদি ইংরাজি এতটুকুও শিখে থাকি সে রণেন মহারাজের দান। ক্লাস সিক্স, সেভেন দু'বছর ইংরাজি ব্যাকরণ পড়িয়েছিলেন মনে আছে। কত সুন্দর ভাবে যে 'Word Making' খেলা শিখিয়েছিলেন ক্লাস সিক্সে তা বলে বোঝানো যাবে না। অনেক চেষ্টা করেছি বর্তমান প্রজন্মকে সেগুলো শেখানোর জন্যে। পারিনি, ভীষণ ভাবে ব্যর্থ আমি! কারণ? যে ভালবাসা নিয়ে তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন সে ভালবাসা তো আমি দিতে পারিনি। সেভেনে পড়ি। রণেন মহারাজের ইংরাজি ট্রানস্লেশনের ক্লাস। দুটো ট্র্যানস্লেশনের কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে, যা আমার ব্যক্তিগত জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় সেই বয়সেই। কীভাবে, আজ আর সেকথা বলার ক্ষমতা নেই। সে বাক্য দুটো হল; এক - 'টাকায় টাকা আনে, কিন্তু শান্তি আনিতে পারে না' - Money begets money, but no peace of mind. অন্যটি- 'নিজের সম্পদ নষ্ট করার অধিকার কারোর নেই' – One should not abuse one's wealth.'

পল্লী-উন্নয়নে মহারাজের আগ্রহের সীমা ছিল না। গ্রামের নালী পরিষ্কার করার কাজে তিনি অগ্রণী। তাঁর এক ছাত্রের স্মৃতি : 'সারগাছির তেঁতুলতলা থেকে সোজা যে রাস্তাটা আমাদের স্কুলের সামনে দিয়ে গেছে বাণীনাথপুরের দিকে, সেই মাটীর রাস্তার পাশের নয়ানজুলির মত নালীটাকে পরিষ্কার করা হবে। সেদিন রণেন মহারাজের যে রূপ দেখেছি সে আজও অম্লান। পরণের ধুতিটাকে হাঁটুর উপরে ভাঁজ করে উঠিয়ে, হাতে কোদাল নিয়ে একাই একশো! নোংরা, কুকুর-বেড়ালের মল তো আছেই, তবে সেদিন সকালের মানুষের মলই বেশী! মহারাজের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই বা কোন বিকার নেই। অন্য কাউকে কিছু করতেও বলছেন না, আমরা হয় সামনে সামনে একটু একটু সাফ করছি ওপর ওপর, আর না হলে পিছন পিছন নোংরা তুলছি, কিন্তু ঐ সোনার রঙের দেহে মুখে চোখে ঘাম ঝরে পড়ছে, আর অফুরন্ত উৎসাহে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কোদাল হাতে। সেদিনের সেই শিক্ষা আমার জীবনের একটা দিক খুলে দেয়। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি যখন যেখানে থেকেছি, সে ভাড়া বাড়িতেই হোক, বা কোম্পানির কোয়ার্টারেই হোক অথবা নিজের বাড়ি, কোথাও কোনদিন নিজে ছাড়া অন্য কাউকে আমার পায়খানা পরিষ্কার করতে দিই নি। আজকে বুঝতে পারি Leadership Quality কাকে বলে!'

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ব্রহ্মচারী রণেন ১৯৬০ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত বেলুড় মঠে সারদাপীঠের শিক্ষণমন্দিরে (বি.এড কলেজ – তখন বিটি কলেজ বলা হত) আসেন এবং বিটি পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৬৫-৬৭ বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কাটান। সেসময় মঠে স্বামী মাধবানন্দজী, দয়ানন্দজী, যতীশ্বরানন্দজী, ওঁকারানন্দজী, বীরেশ্বরানন্দজী, রঙ্গনাথানন্দজী প্রমুখ বিশিষ্ট সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে দেখার ও তাঁদের কথা শোনার সৌভাগ্য হয়। ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে থাকাকালীন তিনি বেলুড় মঠের পরিবেশ আরও ভাল করে আত্মীকরণ করেন। তাঁর আচার্যদের মধ্যে ছিলেন স্বামী ভূতেশানন্দজী, গম্ভীরানন্দজী, তত্ত্বানন্দজী, বোধাত্মানন্দজী ও অন্যান্যরা।

১৯৬৪ সালে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সাধু-সম্মেলনে তিনি

দেখেছিলেন তখনকার সঙ্ঘের নক্ষত্রমণ্ডলীকে। তাঁর স্মৃতি : 'সেখানে ছিলেন নিখিলানন্দজী, প্রভবানন্দজী, সম্বুদ্ধানন্দজীর মতো ব্যক্তিত্বরা। প্রভু মহারাজ তখন সাধারণ সম্পাদক; স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, লোকেশ্বরানন্দজী, এমনকি হিরণ্ময়ানন্দজী প্রভৃতি আরো অনেকে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তখনও অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ।... যতীশ্বরানন্দজী সভাপতি ছিলেন। তিনি তখন সঙ্ঘের একমাত্র সহাধ্যক্ষ। প্রেসিডেন্ট স্বামী মাধবানন্দজী তাঁর ঊরুর অস্থি ভেঙে যাওয়ায় চলাফেরা করতে পারছিলেন না। তাই যতীশ্বরানন্দজী সভাপতিত্ব করছিলেন। যতক্ষণ অন্যেরা বলছিলেন সভার পরিবেশ হালকা চালে আর আনন্দময় ছিল। কিন্তু যখন যতীশ্বরানন্দজী বলতে উঠলেন, সেখানকার সমস্ত পরিবেশটা বদলে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতাময় এক পরিমণ্ডল। তিনি কেবল দশটি বা পনেরটি বাক্য বলেছিলেন। তিনি বললেন, কোন কোন সন্ন্যাসী বড়াই করছেন যে তাঁরা সঙ্ঘে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর ধরে আছেন, কিন্তু যদি আমাদের আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি না হয় তবে সঙ্ঘে থেকে লাভ কি? বার বার তিনি বললেন যে, আমাদের আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে হবে। ...তাঁর কথাগুলি যেন চাবুকের মতো সাধুদের বিবেকের ওপর আছড়ে পড়েছিল।' এই ঘটনাটি মহারাজের মনে এমন দাগ কাটে যে তাঁর জীবনের প্রান্তভাগেও তিনি এইটি বার বার উল্লেখ করতেন।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হয় পরের বছর ১৯৬৮ সালে, নাম হয় ব্রহ্মচারী পরেশচৈতন্য। এর পরের বছরই (১৯৬৯) তাঁর সন্ন্যাস হয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছে। নাম হয় স্বামী শিবময়ানন্দ।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পর সারগাছি ফিরে গেলেও মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১৯৬৭ সালে নিয়ে আসেন বেলুড়ে সারদাপীঠের বিদ্যামন্দির কলেজে, সহকারী প্রধান-অধ্যাপক রূপে। পরে স্বামী শিবময়ানন্দজী হলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (১৯৬৯-৭০)। ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ায় বিদ্যামন্দির কয়েকমাস বন্ধ ছিল। স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ প্রধান-অধ্যাপক পদ ত্যাগ করলে শিবময়ানন্দজী প্রধান-অধ্যাপক হন। তিনি বিদ্যামন্দিরে দু'বার (১৯৭০-৭২ এবং ১৯৭৪-৮০) প্রধান-অধ্যাপক ছিলেন।

তাঁর সময়ে বিদ্যামন্দিরের ছাত্র, বর্তমানে এক বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, সে-সময়কার রণেন মহারাজ সম্বন্ধে জানিয়েছেন, 'তাঁর মুখে হাসি কম। খুব গম্ভীর প্রকৃতির স্বভাব। কিন্তু মিশলে প্রাণোচ্ছল ও আনন্দময় হাসি বেরিয়ে আসত। ... খুব ভাল হিন্দিতে ভাষণ দিতেন। আমাদের 1st yr.-এ Integral Calculas পড়াতেন। Spiritual Heritage-এরও ক্লাস নিতেন। অধ্যাপকদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ও দহরম ছিল। Teachers' Common Room-এ অধ্যাপকদের সঙ্গে আড্ডাও দিতেন। বিদ্যামন্দিরের প্রত্যেক ছাত্র ও অধ্যাপকদের নাম জানতেন এবং পরিচয় ছিল। শেষদিন পর্যন্ত ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। তারাও তাঁর সঙ্গে আজীবন যোগাযোগ রেখেছিলেন। বিদ্যামন্দিরের সব বিভাগের অধ্যাপকদের নাড়ি-নক্ষত্র জানতেন।' পরে এই অধ্যাপকদের কেউ কেউ তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালে মহারাজ বিদ্যামন্দির থেকে কাটিহার চলে যান সেখানকার উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে। তিনি সেখানকার প্রথম সন্ন্যাসী প্রধান-শিক্ষক। ঐ স্কুল ছিল W.B.B.S.E.–র অধীনে। তাঁর নেতৃত্বে কাটিহার স্কুলের একটি ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে ছিল। কাটিহারে মহারাজ খুব অল্প সময়ের জন্য থাকলেও ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও ভক্তদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অঙ্কের ক্লাস ছাত্ররা খুবই পছন্দ করত। বহু বছর পরেও তিনি যখন গেছেন সেখানে, পুরানো দিনের লোকেরা তাঁকে মনে রেখেছিলেন। কাটিহারে স্কুল ছাড়াও পূজা-সহ আশ্রমের প্রতিটি কাজের সঙ্গেই নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন মহারাজ। অল্পদিন পরেই তাঁকে আবার চলে আসতে হল বিদ্যামন্দিরে।

১৯৭৪ সালে বিদ্যামন্দিরের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রধান-অধ্যাপকের দায়িত্ব নিয়ে কাটিহার থেকে বিদ্যামন্দিরে ফিরে এলেন স্বামী শিবময়ানন্দজী। ১৯৭৬ সালে সারদাপীঠের নতুন সম্পাদক হিসাবে এলেন পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ যিনি বর্তমানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ।

বিদ্যামন্দিরের এক প্রাক্তন অধ্যাপকের মন্তব্য, 'কাটিহার পূর্ব-রণেন মহারাজ এবং কাটিহার-পরবর্তী রণেন মহারাজ – এ দু'জনের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কাটিহার-পূর্ব রণেন মহারাজ ছিলেন বেশ কিছুটা একরোখা, কাট কাট কথা বলতেন, ছাত্র বা অধ্যাপকদের সঙ্গে তেমন মেলামেশাও ছিল না। কিন্তু কাটিহার – পরবর্তী রণেন মহারাজকে দেখতে পাই – তিনি এক ভিন্ন মানুষ। অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি তাঁর পূর্বসূরী বরুণ মহারাজ (স্বামী প্রভানন্দজী) প্রদর্শিত পথেই হাঁটলেন এবং অদ্ভুতভাবে অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মচারী, হস্টেল অধীক্ষক – সকলের সাথে মেলামেশা করে, তাঁদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে সকলের মধ্যে গড়ে তুললেন একটা Team spirit। ...Teachers' Council-এর সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে তিনি বিদ্যামন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে আন্তরিক প্রয়াসী হলেন। অনেকের সাথেই তিনি একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুললেন।' বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের সাথে একটা যোগসূত্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন অধ্যাপকদের কয়েকজনের সহযোগিতায় তিনি বিদ্যামন্দিরে প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবের পুনঃপ্রচলন করেছিলেন। আজও সেটি বহাল রয়েছে।

১৯৬৭ সালে সারগাছির প্রধান-শিক্ষকের দায়িত্ব ছাড়ার সময় তিনি "আমি যা যা করতাম" শিরোনামে একটি কাগজে সমস্ত লিখে ভাঁজ করে টেবিলের ড্রয়ারে নিচের দিকে তা রেখে এসেছিলেন। কয়েক বছর পরে তাঁর উত্তরসূরী সেটি পান। পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে ওটি বোধহয় একান্ত অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্ক সেই সন্ন্যাসীর জন্যই তিনি রেখে এসেছিলেন। সেই অনুসারে চলে তাঁর উত্তরসূরী সেই সন্ন্যাসী সুফল পেয়েছিলেন। মহারাজের প্রশাসন যে কয়েকটি আদর্শের ভিত্তিতে চালিত হত তা জানা যায় একটি ঘটনায়। একবার তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ এক সন্ন্যাসী জানতে চান আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিভাবে কলেজ প্রশাসন চালানো যেতে পারে। তিনি তাঁকে একটি ছোট চিরকুটে কয়েকটি কথা লিখে দেন। তার মধ্যে কয়েকটি হল –

ক) Lend all thine ear, but few thy voice (Shakespeare) [অর্থাৎ সবার কথা শুনবে কিন্তু বলবে কম] – প্রশাসনে এটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

খ) নতুন জায়গায় বা পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ প্রথমেই কয়েক বছর বা দশক ধরে চলে আসা পদ্ধতির দোষত্রুটিগুলিই তোমার নজরে পড়বে। ধৈর্য্য ধরে খোলা মন নিয়ে বিবেচনা করলে তুমি তার মধ্যে ভাল জিনিসগুলি খুঁজে পাবে।

গ) ধৈর্য্য ও ক্ষমার অভ্যাস করবে। ঠাকুরের কথা মনে রাখবে – 'শ, ষ, স। যে সয় সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়।'

তাঁর সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বিদ্যামন্দিরের বেহাল আর্থিক দুরবস্থার দূরীকরণ। মহারাজের উদ্যোগে বিদ্যামন্দিরে কর্মশালা প্রভৃতির আয়োজন হয়। প্রায় এর হাত ধরেই কলেজে শুরু হয়েছিল বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচি।

বজ্রকঠোর অথচ কুসুমকোমল হৃদয় ছিল মহারাজের। বিদ্যামন্দিরের ছাত্রাবাসের এক কর্মী এমন একটা গর্হিত কাজ করেছে যে তাকে আর ছাত্রাবাসে রাখা হবে না। তাকে ২/৩ দিন সময় দিয়েছেন ছাত্রাবাস ছেড়ে দেবার। কিন্তু ঐ কর্মীর ওপর দু-তিনটি প্রাণী ছিল নির্ভরশীল। তাই মহারাজ তাকে যেমন ছাত্রাবাস ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন তেমনই তিনিই আবার গোপনে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন অন্যত্র যাতে ঐ কর্মীর একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়।

তিনি খুব সাহসী ছিলেন, ছাত্রদরদী ত বটেই। খুব কড়া হাতে নকশাল আন্দোলনকে সামলে ছিলেন। যেসব ছাত্রেরা নকশালের নেতা—তারা সংখ্যায় ছিল পাঁচজন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ঐ পাঁচজনকে বিদ্যামন্দির থেকে T.C. দেওয়া হবে। আবার ঐ সব ছেলেদের তিনি কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তাদের ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যাহত না হয়।

বিদ্যামন্দিরে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে একটি ছাত্র এসেছিল। খুবই বুদ্ধিমান, সম্ভবতঃ একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে একজন। ছেলেটি রাত্রে অল্প সময়ের মধ্যে নিজের পড়াটা তৈরী করে নিয়ে বাকী সময়টা অন্যদের বিরক্ত করত। বিশেষ করে ঐ সময়ে বিদ্যামন্দিরে নকশাল ভাবের প্রচারে তার হাত ছিল। সংশ্লিষ্ট হস্টেল অধীক্ষক কিছুতেই তাকে সামলাতে পারছেন না বলে সমস্যাটা এল রণেন মহারাজের কাছে। মহারাজ তখন একটি আলাদা বাড়ীতে থাকতেন। মহারাজ ছেলেটিকে বললেন, 'তুই তো ইংরেজী নিয়ে পড়িস, আর আমি অঙ্কের লোক। তোর কাছে আমি একটু ইংরেজী শিখব। তোকে আর হস্টেলে থাকতে হবে না, তুই আমার কাছে থাকবি, হস্টেলে কেবল খেতে যাবি।' তার জায়গা হল মহারাজের ভবনেই। এই ভাবে সেই ছাত্রটির ভবিষ্যৎ জীবন এবং সেই সঙ্গে অন্য ছাত্রদের তার হাত থেকে রক্ষা করলেন মহারাজ।

একবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সবে বিদ্যামন্দিরে প্রথম পিরিয়েড আরম্ভ হয়েছে, তিনি তাঁর অফিস ঘরে বসে আছেন। খবর এল যে বিদ্যামন্দিরের ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে বিদ্যামন্দিরের একটি ছেলেকে নকশালরা অপহরণ করে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির দিকে নিয়ে গেছে। খবর পাওয়া মাত্র তিনি কাউকে

না নিয়ে দৌড়াতে লাগলেন যাতে ছেলেটিকে উদ্ধার করা যায়। পিছনে আরো কয়েকজন দৌড়াচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে করতে আগেই তিনি নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে পৌঁছে গেলেন। দেখলেন ছেলেটিকে কয়েকজন নকশাল ঘিরে আছে। নকশালরা বুঝতে পারল যে ভুল ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। মহারাজ যেতেই তারা ছেলেটিকে ছেড়ে দিল। ছেলেটিকে উদ্ধার করে তিনি নিয়ে এলেন। ছেলেটি তখনও হাঁফাচ্ছে। নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সেদিন তিনি ছেলেটিকে বাঁচিয়েছিলেন।

শিবময়ানন্দজীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিদ্যামন্দির ক্রমশই তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছিল। বিদ্যামন্দির একটু স্থিতিশীল হতে না হতেই মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের প্রধান-অধ্যাপকের দায়িত্ব দিয়ে। ঐ সময় রহড়া কলেজের অধ্যাপকেরা একটা আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন। ঐ আন্দোলনের মোকাবিলা করবার জন্যই রণেন মহারাজকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। সে সময় জনৈক সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'রণেন মহারাজ হলেন trouble shooter; যেখানেই অসন্তোষ, আন্দোলন ও গণ্ডগোল সেখানেই রণেন মহারাজ।' বিদ্যামন্দির ছেড়ে যাবার আগে সব দিক থেকে তিনি বিদ্যামন্দিরকে একটি সুরক্ষিত জায়গায় রেখে গেলেন।

১৯৮০ সালে তিনি বিদ্যামন্দির থেকে রহড়ায় আসেন। সম্ভবতঃ তাঁর জীবনের কঠিনতম অধ্যায় এটি। সেসময় তাঁকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট একদল অধ্যাপকের তীব্র বিরোধিতা, এমনকি শারীরিক নিগ্রহেরও সম্মুখীন হতে হয়। কয়েকজন অধ্যাপক সেই রাজনৈতিক দলটির প্ররোচনায় কিছু ছাত্র ও অভিভাবকদেরও বাধ্য করে নানাভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অসুবিধা সৃষ্টি করতে। সেসময় মহারাজের আধ্যাত্মিক জীবনের দৃঢ় ভিত্তি, ঠাণ্ডা মাথা এবং সস্নেহ ব্যবহার তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিল।

আর ছিল তাঁর সবার সঙ্গে মেশার ক্ষমতা। রহড়াতে মহারাজ ছাত্রাবাসের ছাত্রদের মাঝেই খেতে বসতেন। তখন রাত্রে প্রায়ই আলু-মিষ্টি কুমড়োর ঘ্যাঁট হত। ছাত্ররা খেতে যাবার আগে ভাঁড়ার ঘর থেকে কাঁচা লঙ্কা নিয়ে যেত এবং পাতে ঘ্যাঁট পড়লে অনেকেই তার থেকে আলুগুলি তুলে নিত। দু'-একজনের দায়িত্ব ছিল সেই আলুগুলি একজায়গায় করে লঙ্কা দিয়ে মেখে যারা যারা আলু দিয়েছে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া। ছেলেদের সঙ্গে তাল দিয়ে এই আলু তুলে দেওয়ার দলে মহারাজও থাকতেন; ছেলেরা তাঁকে দিতে সঙ্কোচ করলে নিজে চেয়ে নিতেন।

এই অসুবিধার সময়ে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রথম বর্ষের ছ'জন ব্রহ্মচারীকে পাঠান। এই ব্রহ্মচারীরা কলেজের কাজে ও কলকাতায় হাইকোর্টে বিভিন্ন কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। সেসময় সঙ্ঘের আইনি উপদেষ্টা রূপে শক্তিনাথ মুখার্জী, দীপঙ্কর গুপ্ত ও শিবলাল বোস প্রমুখ আইনজীবিরা অনেক সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালেও মহারাজ এঁদের সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রেখেছিলেন এবং সবসময় যোগাযোগ রাখতেন।

রহড়াতে তাঁকে দেখেছেন এমন এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর স্মৃতি : 'মনে পড়ে ১৯৮১ সালে সাধুনিবাসের ঘরে কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল একের পর এক কলেজের

সমস্যাগুলো বলতে যাচ্ছেন। শিবময়ানন্দজী হেসে বললেন, "আমাদেরকে relay race-র baton হাতে নিয়ে দৌড়তে হবে; এতদিন আপনি দৌড়লেন এখন আমি দৌড়ব।" কলেজে তখন আগুন জ্বলছে, উনি হেসে নিরুদ্বেগে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

'পরের দিন উনি কলেজে গিয়েছেন। Principal-এর চেয়ারে একটি poster সাঁটা আছে, "An Imposter is replaced by a Criminal"। তৃতীয় বা চতুর্থ দিন কলেজে গিয়ে Principal-এর ঘরে ঢুকে দেখেন জনৈক অধ্যাপক Principal-এর চেয়ারে বসে আছেন। উনি দূরের একটি চেয়ারে বসলেন। অধ্যাপক একটি সিগারেট ধরাবেন বলে মুখে নিয়ে তাঁর দিকে একটি সিগারেট বার করে দিলেন। উনি দেশলাই জ্বালিয়ে সেই অধ্যাপকের সিগারেটটি ধরিয়ে দিলেন। অধ্যাপক এতটা ভাবতেই পারেননি। অধ্যাপক ধোঁয়া ওঁর মুখের উপর ছুঁড়ে বেরিয়ে গেলেন। বিকালে আমরা ঘটনাটা জানলাম। মহারাজের মুখের হাসি কিন্তু অমলিন।'

এর অল্প ক'দিন পরে ছাত্রেরা মহারাজকে কলেজের সামনে বেলা ১১টা নাগাদ ঘেরাও করেছেন। তিনি সেখানে একটি গাছের গোড়ায় বসে আছেন। বালকাশ্রম সম্পাদক মহারাজ সেটি জানতে পেরে নিজেই কলেজে যেতে চাইলেন এবং পুলিশকে খবর দেবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। শিবময়ানন্দজী কিন্তু মানা করলেন। বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ একজন অধ্যাপক, যিনি মিশনের সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মী সকলের কাছে মানিত, তিনি এসে বললেন, 'মহারাজ, আমি দুঃখিত। আপনাকে এইভাবে ঘেরাও করে ছাত্ররা বাইরে বসিয়ে রেখেছে এর জন্য আমি ছুটে এসেছি। আপনি উঠুন এবং ঘরে যান। কেউ বাধা দেবে না।' মহারাজ হেসে আশ্রমে ফিরে এলেন। আরেকদিন কলেজের ছাত্ররা বিশেষ রাজনৈতিক দলের যুবকদের সাথে নিয়ে মহারাজের অফিসের সামনের বারান্দায় লম্বা হয়ে শুয়ে তাঁকে বেরতে দেয় নি। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ মহারাজ কলেজ থেকে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

কিছুদিন পর কলেজের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে ১১ জন ছাত্রকে T.C. দেবার সিদ্ধান্ত হয়। বহু আবেদন, নিবেদন, শাসানি, সবকিছুর মধ্যে তিনি দৃঢ় ছিলেন। কিছুতেই সিদ্ধান্তে নড়চড় করেন নি। ১৯৮৫ সালে বেলুড় মঠে রহড়া কলেজ প্রসঙ্গে একটি আলোচনা সভা হয়। তাতে অনেকে নানা মত পেশ করেন। মহারাজ কিন্তু শুধু বলেছিলেন, 'সর্বভূতকে অভয়দান – সন্ন্যাসের এই মন্ত্রটি আমাকে মানতে হবে।' এর কিছুদিন পরে তিনি তপস্যায় চলে যান।

'সহ্যের সমান গুণ নাই' কথাটির বাস্তব প্রয়োগ মহারাজের জীবনে দেখা গিয়েছিল। রহড়ায় তাঁর অপ্রতিকারপূর্বক সহনশীলতায় আন্দোলনকারীদের কারো কারো মনে পরিবর্তন আসে। তিনি চলে আসার পর বিরোধী শিক্ষকেরা অনেকেই অনুতাপ করেছেন। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে, মহারাজের সাথে খারাপ ব্যবহার করা ঠিক হয় নি। মহারাজ যখন তপস্যায় গিয়েছেন, তখন বেশ কিছুকাল তাঁকে না দেখতে পেয়ে দু'জন অধ্যাপক একদিন এক সন্ন্যাসীর কাছে জানতে চাইলেন মহারাজ কবে ফিরবেন। সেই সন্ন্যাসী বললেন, 'কেন, আপনারা তো চান না তিনি

প্রধান-অধ্যাপক থাকুন। এখন আবার তাঁর খোঁজ নিচ্ছেন কেন?' তাঁরা একটু আমতা আমতা করে বলেছিলেন, 'আসলে কি জানেন? কলেজটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।'

এইসব আন্দোলন, কুকথা এগুলো তাঁকে প্রভাবিত করে কিনা জানতে চাইলে অন্য এক সময়ে শিবময়ানন্দজী এক বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রহ্মচারীকে বলেছিলেন, 'জানিস্ তো, পুরাকালে সাধুদের কত তপস্যা করতে হত, কুটিয়া বাঁধতে হত, ভিক্ষা করতে হত। এখন শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় আমাদের মাথার উপর ছাদ আছে, দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা আছে। মা তাই এইসব পরিস্থিতি তৈরী করে আমাদের মানসিক তপস্যা করিয়ে নেন। এইটুকুতে কাতর হলে চলবে?'

মহারাজের জীবন ও শিক্ষা প্রেরণাপ্রদ ছিল। বিদ্যামন্দিরে ও রহড়ায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছেন – অনেকেই এখন প্রবীণ সন্ন্যাসী। তাঁর সারগাছি, বিদ্যামন্দির ও রহড়ার ছাত্রদের অনেকেই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মহারাজের সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই যোগাযোগ ছিল আজীবন।

১৯৮৯ সালে তিনি রহড়া থেকে এক বছরের জন্য তপস্যা করতে যাবার অনুমতি পান ও পরে তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। এরমধ্যে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত তিনি মিশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯৯০ সালে সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী থাকাকালীনই তিনি রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য মনোনীত হন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের দায়িত্ব নিয়ে ১ জুন ১৯৯১ থেকে বেলুড় মঠেই বাস করতে থাকেন।

১৯৯২ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। সেসময় পূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ৩ এপ্রিল ১৯৯৫ শিবময়ানন্দজী সহকারী সম্পাদক পদ ছেড়ে সারদাপীঠের সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৭ পর্যন্ত ঐ পদেই থাকেন। ২০ অক্টোবর ১৯৯৭ তিনি আবার সহকারী সম্পাদক পদে বৃত হন। পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ তখন সাধারণ সম্পাদক। আগেও সারদাপীঠে উভয়ে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। দু'বার সহকারী সম্পাদক রূপে মহারাজ মঠ ও মিশনের ত্রাণসেবা, ভাবপ্রচার পরিষদ, বেদ বিদ্যালয়, আইন বিভাগ প্রভৃতি নানা বিষয় পরিচালনা করেছিলেন। এই সময়ে স্বামীজীর পরিকল্পিত বেদবিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সদর কার্যালয়ে থাকাকালীন তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন এক সন্ন্যাসী : 'রামকৃষ্ণ মিশনের সদর কার্যালয়ে ১৪ বছর থাকার মধ্যে পূজনীয় স্বামী শিবময়ানন্দজীকে পেয়েছি প্রথম ৯ বছর সহকারী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে। আমি ওনার ঘরের উল্টো দিকের ঘরে থাকতাম। একদিন সকালে ঘরে বসে পড়াশুনা করছি। বাইরে থেকে শব্দ আসছে কেউ খুব জোরে "লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা" গ্রন্থ থেকে একটানা পাঠ করছে। দরজা ফাঁক করে দেখলাম শিবময়ানন্দজীর ঘরে যে ছেলেটি সেবা করে সে মহারাজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ করছে আর মহারাজ চেয়ারে বসে কিছু পড়ছেন। আমাদের

অফিসে যাওয়া অবধি সে পাঠ চলতেই থাকল। দুপুরে প্রসাদ পেয়ে ফেরার পথে শিবময়ানন্দজীর সঙ্গে দেখা হতে সকালের পাঠের কারণ আমরা জানতে চাইলাম। মহারাজজী হাসতে হাসতে বললেন, "আর বলিস্ না, সে ছেলে রোজ কাজ করতে এসে এর তার নামে লাগায়, বারণ করলেও শোনে না। তাই আজ ওই বইটা পড়তে দিয়েছি। লোকের কূট আলোচনা করে কেন শক্তিক্ষয় করবে, ভালো জিনিস পড়ে শক্তিক্ষয় করুক, মনও ভালো হবে, দোষদৃষ্টিও ঘুচবে।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আর যদি এই দাওয়াই ফেল করে? মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, "তাহলে তুরীয়ানন্দজীর পত্রাবলী পড়তে দেব। সে বইয়ের ছত্রে ছত্রে সংস্কৃত শ্লোক আছে, দাঁত দু-চারটে ভাঙলে ফল ভাল হবে, বুঝলি।" আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম এক কল্যাণকামী সন্ন্যাসীকে যিনি এমন শাস্তি দেন তাতে যিনি শাস্তি পাচ্ছেন তিনি সংশোধিত হন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনও উন্নত হয়।'

২০০৭ সালে মহারাজ সহকারী সম্পাদকের পদ ছেড়ে সদর কার্যালয়ের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ভাবপ্রচার পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি ও সদস্য আশ্রমগুলির মঙ্গলের জন্য মহারাজের অবদান চিরস্মরণীয়। এই সদস্য আশ্রমের প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে তাঁর ছিল হৃদ্যতার সম্পর্ক এবং তারাও মহারাজের কাছে আপনবোধে দাবি জানাত।

মহারাজ ১৯৯১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী সঙ্ঘের ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন এবং কার্যনির্বাহের দিকটি দেখভাল করতেন। বেলুড় মঠের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন ভাবপ্রচার পরিষদের অধিবেশনে যেমন তিনি যেতেন, পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত সাধুদেরও প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাতেন। কীভাবে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবটি প্রচার করতে হবে, তা অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে তিনি বুঝিয়ে দিতেন। ভাবপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য যে ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে ভালোবাসা, আধ্যাত্মিক জীবন গঠন, সেদিকেই সকলকে নজর দেওয়ার কথা বলতেন – কিন্তু কেবল উপদেশ কিংবা নির্দেশের মাধ্যমে নয়, বরং নিজের জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে।

ভাবপ্রচার পরিষদের কাজ এবং ভাবপ্রচারের কাজের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা বোঝানোর জন্য তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। নাম দেন – "ভাবপ্রচার বনাম ভাবপ্রচার পরিষদ"। সাংগঠনিক দিকে আরো বেশী সচেতন না হলে ভাবপ্রচার পরিষদের সদস্য আশ্রমগুলির যে দুর্দশা হয় তা দেখেই তিনি এই অমূল্য রচনাটি ভবিষ্যতের জন্য রেখে গেছেন।

ভাবপ্রচার পরিষদ ছিল পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পরিকল্পনা। তাঁর ভাবনা মহারাজ আপ্রাণ রূপায়িত করতে চেষ্টা করতেন। ফলে তাঁর ওপর গহনানন্দজী মহারাজের গভীর স্নেহ ও প্রচণ্ড আস্থা ছিল।

এরপর ২০০৯ সালে তিনি কলকাতায় স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ী কেন্দ্রের অধ্যক্ষ রূপে ২০১২ অবধি সেখানে ছিলেন। সেসময় কেন্দ্রটির বেসামাল অবস্থা সামলে দিয়ে তিনি আবার ফিরে আসেন বেলুড় মঠে। স্বামীজীর বাড়িতে একটি ছোট দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। পরে তাঁর উৎসাহে সেটি বড় হয়ে চোখের, ডায়াবেটিস, ইএনটি ইত্যাদি ইউনিট যুক্ত হয়েছিল। তিনি নিজে যেমন স্বাধীন ভাবে চলাফেরা

কাজকর্ম করতেন তেমনি তাঁর অধীনস্থ কর্মীদেরও স্বচ্ছন্দে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দিতেন।

দুর্গত মানুষের পাশে থাকার প্রবণতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। স্বামীজীর বাড়িতে থাকার সময় একবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকায় ত্রাণ বিলির জন্য সাধুদের সকলকে নিয়ে গেলেন এবং এক-একজনকে এক-একটি এলাকা ভাগ করে দিলেন। ভিন্ন-ভিন্ন এলাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে তিনি সকলকে নিয়ে বিকেলের পর ফিরে এলেন।

অন্য একবার বিহারে সাহারসা, পূর্ণিয়া, কাটিহার অঞ্চলে কুশী নদীর বিধ্বস্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে ত্রাণকার্য দেখতে যান মহারাজ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ত্রাণকার্য দেখে মহারাজ মানুষের দুঃখে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সেবাকর্মী ও সাধুদের ঠাকুরের কথা বলে খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন।

আরেকবার রামকৃষ্ণ মিশনের ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা ত্রাণকার্য পরিদর্শনে গেছেন মহারাজ। নৌকা করে কয়েক ঘণ্টার যাত্রা। সঙ্গী সন্ন্যাসীকে বলে রেখেছেন রিলিফ ক্যাম্পে পৌঁছে ক্যাম্পের ভাঁড়ারে ঢুকে লুকিয়ে তাদের খাবার-দাবারের খোঁজ নিতে। আসার সময় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের এক হাজার টাকা ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীর হাতে দিতে বলে বলেন, 'এই টাকাটা তুই দিবি, বলবি না যে আমি দিয়েছি।' ফেরার পথে মহারাজের চোখে জল দেখে সন্ন্যাসীটি কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহারাজ বলেছিলেন, 'এতগুলি লোকের এত কষ্ট চোখে দেখা যায় না।'

কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের উদ্যোগে একটি কুষ্ঠ পল্লীতে চিকিৎসা, শিক্ষা স্বনির্ভরতা এসব ক্ষেত্রে বহুমুখী সেবার কাজ শুরু করা হয়। সব দেখে মহারাজের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। অধ্যক্ষ মহারাজকে বলেছিলেন, 'ঠাকুর আপনাকে কোলে তুলে নেবেন।'

স্বামীজীর বাড়ি থেকে বেলুড় মঠে ফিরে মহারাজ আবার ভাবপ্রচার পরিষদের দায়িত্ব সামলাতে থাকেন ২০১৪ পর্যন্ত। এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ২০১২ সালে ইউরোপের বেদান্ত কেন্দ্রগুলির অধ্যক্ষদের সম্মেলনে বেলুড় মঠের প্রতিনিধিরূপে শিবময়ানন্দজী জার্মানি যান। সেখান থেকে ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ, বিশেষ করে স্বামীজীর স্মৃতিধন্য স্থানগুলি দর্শন করেন। সেবার তিনি ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যাণ্ড ও রাশিয়া সফর করেছিলেন।

স্বামী শিবময়ানন্দজীর মধ্যে সাধুজীবনের ত্যাগের মহিমা সদা প্রোজ্জ্বল। একজন প্রবীণ সাধুর মুখে শোনা, অছি পরিষদের মনোনয়নের জন্য তাঁর নাম ওঠার পরে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যাতে তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ উত্তরে জানান, 'তোমার নাম আমরাই ঠিক করেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হলে নাম মনোনয়নের প্রক্রিয়ার সময় বাদ চলে যাবে।'

স্বামী শিবময়ানন্দজী ছিলেন প্রচারবিমুখ, আত্মভোলা সন্ন্যাসী। শিবের উপযুক্ত নাম। জপ-ধ্যানে তাঁর ছিল প্রগাঢ় নিষ্ঠা। শত কাজের মধ্যেও তিনি জপ করতে বাদ দিতেন না। পরেও বয়সের ভারে পারছেন না বসে থাকতে—বসতে অসুবিধা হচ্ছে। তবুও বসে বসে জপ করতেন—হয়তো নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণের জন্য।

রহড়ায় শিবময়ানন্দজীকে দেখা গেছে যে কলেজের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ, ছাত্রদের ক্লাস নেওয়া, মামলা-মোকদ্দমার কাগজ দেখা, বহু জনের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো প্রভৃতি ঝামেলার মধ্যে থেকেও নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের কার্যক্রমে তাঁর এতটুকু শিথিলতা ছিল না। জপ-ধ্যান, শাস্ত্রপাঠাদি সময়মত করে নিতেন। রাত্রে শোওয়ার আগে প্রতিদিন কথামৃত পাঠ করতেন। পূজনীয় পরিতোষ মহারাজের সঙ্গে বসে নিয়মিত কিছু পাঠ হত। এছাড়াও তখন প্রতি শনিবার রাত্রে সাধু-ব্রহ্মচারীদের আয়োজিত জপ-যজ্ঞে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। মাঝে-মধ্যে খড়দহ শ্যামসুন্দর মন্দিরে যেতেন। প্রায় প্রতিদিন নিকটস্থ শিবমন্দিরে যেতেন, সোমবার-সোমবার শিবের মাথায় জল ঢালতেন।

সারদাপীঠে থাকাকালীন তাঁর এক সহকারী সন্ন্যাসী দেখেন মহারাজ তাঁর ঘরে চলে যান কোন একটি সময়ে। তিনি পাশের ঘরেই থাকতেন। একদিন নিজের ঘরে এসে সহকারী-সন্ন্যাসীটি দেখেন মহারাজ তাঁর ঘরে ধূপ জ্বেলে ধ্যানে মগ্ন।

এই গুণটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মন্ত্রদীক্ষাগুরু পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের কাছে। তাঁর কাছ থেকে তিনি আর একটি গুণ পেয়েছিলেন—প্রণামের সময় কথামৃতাদি পাঠ করা। ভক্তেরা পাঠ করতেন—তিনি শুনতেন। কথামৃত মহারাজের ভাল করে পড়া ছিল। সহকারী সম্পাদক থাকার সময় বেলুড় মঠের প্রধান কার্যালয়ে রাত্রে কথামৃত পাঠ হত। পাঠের সময় কোন জায়গায় সন্দেহ হলে পাঠ থামিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। কখনো পাঠের পর এ নিয়ে আরও আলোচনা হত। তখন কথামৃত আনিয়ে খোঁজা হত এবং দেখা যেত মহারাজের কথাই ঠিক।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় অবিচল বিশ্বাসই ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। ১৯৯০-এর দশকে একবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোন একটি আশ্রমে ভক্ত-সম্মেলনে তিনি অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ করছিলেন, একটি তরুণ হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করেন, তাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে কিনা। উত্তরে মহারাজ বলেন, 'ঈশ্বরদর্শন বলতে তুমি কি বোঝ আমি জানি না। তবু এটুকু জোরের সঙ্গে বলতে পারি – শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারবরিষ্ঠ, যুগাবতার, স্বয়ং ভগবান। এই কথাগুলো সম্পর্কে আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে কোন সংশয় হয় না। ঠাকুরের কৃপায় একশো ভাগ conviction হয়েছে যে তিনিই যুগ-ঈশ্বর।'

সাধন-ভজন-তপস্যার প্রতি তাঁর আজীবন টান ছিল। প্রতিবছর আঁটপুরে ত্যাগব্রত সঙ্কল্পের দিনটিতে (২৪ ডিসেম্বর) মহারাজ কলকাতার আশেপাশে যেখানেই থাকুন না কেন, সেখানে চলে যেতেন এবং ধুনিঘরে সারারাত্রি ধ্যান করে ভোরবেলা ফিরতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো সেরে সাধু হয়েও তপস্যার প্রতি স্বভাবতই তীব্র টান অনুভব করতেন শিবময়ানন্দজী। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে কর্মযোগে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেকথা জেনেও মনে তীব্র ইচ্ছা উঠলে মহারাজ মাঝেমধ্যে হিমালয়ে চলে যেতেন। ছুটি পেলে তো কথাই নেই, না পেলেও যেতেন। উত্তরকাশী, হৃষীকেশ, কনখল, অমরকণ্টক – এইসব অঞ্চলে বারবারই গেছেন। একসময় তপস্যায় গিয়ে তিনি হরিদ্বারে সপ্তসাগরের ধারে ডাল-রুটি ভিক্ষা করে খেতেন আর জপ-ধ্যানাদিতে মগ্ন থাকতেন।

একবার আরেক সন্ন্যাসীর সঙ্গে মহারাজ তপস্যার জন্য উত্তরকাশীতে রয়েছেন। একদিন তাঁরা দুজনে পাহাড়ের কোলে বসে আছেন, মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'সামনের পাহাড়টা যদি না থাকত তাহলে এই বিশাল দিগন্ত আমাদের কাছে খুব সহজেই উন্মোচিত হতো, তাই না? অন্তত ভগবানের বিশ্বরূপের একটু ছোঁয়া পেতাম।'

একবারের কথা। সেইবার তাঁকে তপস্যা থেকে মঠে ডেকে আনা হলে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাঁকে স্বামী ভূতেশানন্দজীর সঙ্গে কথা বলতে বলেন। ভূতেশানন্দজী নিরঙ্কুশ সাধন-ভজনের জন্য বাইরে জীবন কাটানোর তাঁর অভিপ্রায় শুনে বলেন, 'তোমার বক্তব্য নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করো। ভগবান লাভ বলতে তুমি কী বুঝেছ?' রণেন মহারাজ তাঁর ধারণা অনুযায়ী বললেন, 'সমস্ত মন-প্রাণ ঈশ্বরে নিবেদন করা, তাঁতে নিবিষ্ট হওয়া অথবা আত্মচিন্তায় মগ্ন থেকে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করা। উত্তরাখণ্ডী সাধুরা এসব ছাড়া অন্যকিছুতে মন দিতে চায় না। বলে – বিক্ষেপ হয়।'

ভূতেশানন্দজীও সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও যখন ওখানে তপস্যায় ছিলাম, ওকথা শুনেছি। সেবাকাজের প্রসঙ্গ উঠলেই ওখানকার সাধুরা বলত, 'বিক্ষেপ হোতা হ্যায়'।" ভূতেশানন্দজী এরপর তাঁর নিজের চোখে দেখা একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেন : 'দুজন সাধু একসঙ্গে ছিল। একজন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে অপরজন তাকে ছেড়ে চলে যায়। অন্যেরা যখন জিজ্ঞাসা করল, সাধুটিকে তুমি ছেড়ে এলে! সে বলল, "বিক্ষেপ হোতা হ্যায়"।' আচ্ছা, "বিক্ষেপ হোতা হ্যায়" বলতে কী বোঝায়? – ঈশ্বরে মন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধ বা বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। জপধ্যান করতে করতে তোমার যখন খিদে পায় কিংবা তোমার শরীর যখন খারাপ হয়, তখন কি তুমি তুষ্ট থাকো? শান্ত থাকো? তার জন্যও তো "বিক্ষেপ" হয়! তাহলে, নিজের জন্য যদি বিক্ষেপ মেনে নিতে পারো, অন্যের শরীরের জন্যও মেনে নেবে না কেন? তুমি বেদান্ত চর্চা করো। ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা যখন নেই, তাহলে "অন্য" যাকে বলছি, সেও তো "আমি"-ভিন্ন আর কেউ নয়, তাই না?'

ভূতেশানন্দজীর ক্ষুরধার বিচার-বুদ্ধির সামনে রণেন মহারাজের মন নরম হতে থাকে। ভূতেশানন্দজী বলে চলেন, 'স্বামীজী চেয়েছেন আশিষ্ঠ-দ্রঢ়িষ্ঠ-বলিষ্ঠ-শিক্ষিত-মেধাবী যুবক। তিনি ভারতবর্ষকে যে নির্জীবতার তমসা থেকে টেনে তুলতে চেয়েছেন কর্মযোগের মাধ্যমে, "সর্বজীবে ব্রহ্ম" উপলব্ধির মাধ্যমে – তা থেকে কেন তোমরা আবার পিছিয়ে যাচ্ছ? স্বামীজী ভারতবর্ষের আদর্শকে নবরূপদানের মাধ্যমে আধুনিক করেছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত এই যে, যখন ছুটি পাবে, সময় পাবে, শুধুমাত্র তখনই সংঘের কাজকে খানিক সরিয়ে রেখে সাধন-ভজনে সম্পূর্ণভাবে মন দেবে। নতুবা, কর্মযোগ এবং সেবাযোগ ও উপাসনা – দুটি একই সঙ্গে চলবে। এতেই জোর দিয়েছেন স্বামীজী।' এই প্রসঙ্গেই কনখল আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন 'সন্ন্যাসী ও সমাজ' অভিভাষণে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মুখে মহারাজ শুনেছিলেন সন্ন্যাসীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা।

পরবর্তী সময়ে শিবময়ানন্দজী বলতেন, 'আমি তো সাধনভজন নিয়েই থাকতে চেয়েছিলাম। গম্ভীরানন্দজী আমায় ভূতেশানন্দজীর হাতে ফেলে দিয়ে আটকে

দিলেন।' তপস্যা-নির্জনবাসের প্রতি টান শিবময়ানন্দজীর আজীবনই ছিল। তবে এরপর থেকে মহারাজ নিয়মিত ছুটি – গ্রীষ্মকালীন কিংবা পূজার ছুটিতে কোথাও না কোথাও তপস্যায় যেতেন। এছাড়াও মনে যখন অত্যন্ত আগ্রহ জন্মাত, ছুটির জন্য তখন আবেদন জানাতেন।

এরকমই একটি ঘটনা। কলেজের বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে মহারাজ গেছেন সহকারী সম্পাদক স্বামী চিদাত্মানন্দজীর (অলোপী মহারাজ) কাছে। সঙ্গে করে আনা ছুটির আবেদনপত্রটি অলোপী মহারাজের হাতে দিয়েওছেন। কলেজের সমস্যাগুলি নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, অলোপী মহারাজ বেশ ধীরে ধীরে কলেজ-বিষয়ে রণেন মহারাজের কিছুকিছু বক্তব্য খণ্ডন করতে শুরু করলেন। আসলে, সবটা তিনি মেনে নিতে চাইছিলেন না। কখনো কখনো উত্তেজিত হয়ে মৃদু ভর্ৎসনাও করছিলেন। এভাবে কণ্ঠস্বর একটু উচ্চমাত্রায় উঠতে শুরু করলে রণেন মহারাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম ও বিনয়ের সঙ্গে মিষ্টস্বরে বললেন, 'মহারাজ, আপনি আমায় যত ইচ্ছা বকুন, কিন্তু দয়া করে আমার ছুটিটি অনুমোদন করবেন। আর ছুটির দিনকয়টি কমাবেন না।' এমন মিনতি শুনে অলোপী মহারাজ না হেসে আর পারলেন না।

মহারাজ অল্প কিছুদিনের জন্য সময় পেলেও তীর্থদর্শনাদিতে অথবা সঙ্ঘেরই কোন না কোন কেন্দ্রে নির্জনবাসে চলে যেতেন। অনেক দিন দেখা গেছে কাঁধে একটা অতি সাধারণ ব্যাগ ঝুলিয়ে (যার মধ্যে একটা আসনও থাকত) মঠ থেকে বাসে চেপে চলেছেন – হয়তো বা দক্ষিণেশ্বর।

১৯৭৫ সাল স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী (রথীন মহারাজ), সুমেধানন্দজী (সুজিত মহারাজ) এবং শিবময়ানন্দজী পায়ে হেঁটে আঁটপুর হয়ে জয়রামবাটী-কামারপুকুর দর্শন করে আবার পায়ে হেঁটেই ফিরে আসেন। বালি স্টেশন থেকে খালিপায়ে তাঁদের যাত্রা আরম্ভ হল। সুমেধানন্দজীর মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি, জ্যোতিরূপানন্দজীর হাতে কমণ্ডলু আর শিবময়ানন্দজীর কাঁধে কম্বল। বেশ কিছুটা যাবার পর তাঁরা দেখেন, একদল ছেলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। হঠাৎ সেই দলের একটি ছেলে সাইকেলে চেপে তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ায়। শিবময়ানন্দজীর ধমক খেয়ে সে অবাক হয়ে কাচুমাচু মুখে সরে পড়ে। পরে প্রকাশ পেয়েছিল, ছেলেগুলি নিজেদের মধ্যে এই বিচিত্রবেশী সাধুরা কারা তাই নিয়ে তর্কাতর্কি করছিল। শেষে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য একটি ছেলে সাইকেল নিয়ে দেখতে আসে। সে আবার বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। তার 'প্রিন্সিপাল মহারাজ'-কে এই অদ্ভুত দলে দেখে সে বেচারি লজ্জা পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল।

পথে আরেক এক রাতে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন এক তান্ত্রিকের কুটিরে। সেই তান্ত্রিক ভিক্ষা করে তাঁদের মুড়ি ইত্যাদি খেতে দেন। ভোরবেলায় তাঁদের গাওয়া 'যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর' ইত্যাদি গান শুনে সেই তান্ত্রিক মুগ্ধ হন। আরেকদিন আঁটপুরের কাছে পথশ্রমে শিবময়ানন্দজী এত কাতর হন যে রাস্তাতেই শুয়ে পড়েন প্রায় অচেতন হয়ে। কিছুক্ষণ পরে সামান্য সুস্থ হয়ে আবার সঙ্গীদের ধরে ফেলেন। তিনি তাঁদের টের পেতে দেন নি তাঁর অসুবিধার কথা, তাঁদের এগিয়ে যেতে বলেছিলেন। পরে তাঁর মাথায় ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে তাঁকে

সুস্থ করা হয়। পথে তাঁরা দেখেন উদ্বোধনের স্বামী নিরাময়ানন্দজী ও সস্ত্রীক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন গাড়িতে করে চলেছেন কামারপুকুরে। তাঁদের সঙ্গে শিবময়ানন্দজীর পরিচয় ছিল। তাঁরা কিন্তু মহারাজকে দূর থেকে দেখে চিনতে পারেন নি।

এর আগেও একবার রথীন মহারাজ, কালিপদ মহারাজ ও শিবময়ানন্দজী অমরনাথে গিয়েছিলেন। তাঁরা শ্রীনগর থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন অমরনাথের পথে। অমরনাথ দর্শন করে তাঁরা খুব তৃপ্তি পেয়েছিলেন। পরে শ্রীনগরে ফিরে এসে কয়েকদিন সেখানে থাকার পর তাঁরা আসেন চন্ডিগড়। চন্ডিগড় থেকে শিবময়ানন্দজী ও রথীন মহারাজ চলে এলেন হরিদ্বার এবং সেখান থেকে আবার পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন যমুনোত্রীর দিকে। পথে প্রবল বৃষ্টিতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হন তাঁরা। শিবময়ানন্দজী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অসুস্থতার জন্য যাতে রথীন মহারাজের যাত্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটে তাই কৌশল করে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পথে অসুস্থ শরীরে নানা কষ্ট ভোগ করে তিনদিন পর তিনি উত্তরকাশীতে পৌঁছন; ততদিনে রথীন মহারাজ সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। এবার মহারাজ এত অসুস্থ হয়েছিলেন যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল – প্রায় একমাস ভুগে মঠে ফিরে আসেন। সে সময় তাঁর ফিরে আসার পাথেয় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্বামী প্রথমানন্দ (প্রীতি মহারাজ)।

পরে পরিণত বয়সেও মহারাজ রথীন মহারাজের সঙ্গে প্রয়াগ হয়ে রামনবমীর দিন হাজার হাজার লোকের ভিড় ঠেলে অযোধ্যাতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপাল মূর্তি রামলালাকে দর্শন করেন।

শাস্ত্রপাঠেও তাঁর ছিল অনুরাগ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, যোগবাশিষ্ঠ, স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, স্বামীজীর রচনাবলী তাঁর মুখস্থ ছিল। বার বার তুরীয়ানন্দজীর পত্র পড়তে বলতেন। প্রায়ই বলতেন, '[আচার্য] শঙ্করের বই পড়লে বৈরাগ্যের উদয় হয়।'

কঠোপনিষদের (২/৩/১) একটি শ্লোক মাঝে মাঝেই আবৃত্তি করতেন, 'ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।' শুধু তাই নয় শ্লোকটির শাঙ্করভাষ্য-সহ উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, 'অবিচ্ছিন্ন-জন্ম-জরা-মরণ-শোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ, প্রতিক্ষণমন্যথাস্বভাবো মায়ামরীচ্যুদক-গন্ধর্ব-নগরাদিবৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদবসানে বৃক্ষবদভাবাত্মকঃ কদলীস্তম্ভবৎ নিঃসারঃ' – অর্থাৎ এই সংসারবৃক্ষ নিরন্তর জন্ম-জরা-মরণ-শোক প্রভৃতি অনেক অনর্থবিশিষ্ট, প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল এই সংসার ভোজবাজি বা মরীচিকার জল বা গন্ধর্বনগরীতুল্য দৃষ্টনষ্টস্বরূপ বলে বৃক্ষের মতো অভাবেই পর্যবসিত হয়; কলাগাছের মতো এটি অসার। তিনি নিজেও বাস্তবে অনুভব করতেন এই সংসার কদলীবৃক্ষবৎ অসার।

মহারাজের মহাভারত ও পুরাণ খুব ভাল করে পড়া ছিল। পরবর্তীকালে বহুবার পুরাণের বা মহাভারতের নানা গল্প বলতেন – বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। শাস্ত্র ও পুরাণের অনেক শ্লোক তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। একবার এক ঘনিষ্ঠ ভক্তকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আপনাকে চিঠি লিখতে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক মনে হয়েছে, নীচে লিখলাম – কাউকে দিয়ে পড়িয়ে শুনলে ভাল

লাগবে – ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ। / ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈ বৈষ্ণবাগ্র্যঃ।। [(ভাগবত, ১১/২/৫৩)] - ব্রহ্মাদি দেবগণ অন্বেষণ করেন যে শ্রীহরির পাদপদ্ম, ত্রিভুবনের রাজত্বের জন্যও সেই ভগবৎপাদপদ্ম থেকে মুহূর্তের জন্যও যেই ভক্তের মন বিচ্যুত হয় না, তিনিই ভক্তদের মধ্যে অগ্রণী।'

পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কাছে সকালের প্রণামের সময় তিনি মাঝে মাঝে শাস্ত্রাদির কূট প্রশ্ন করতেন। ভূতেশানন্দজী মহারাজ অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাঁকে। প্রেসিডেন্ট হয়ে যখন ভূতেশানন্দজী মঠে আছেন, মাঝে মাঝে বেড়াতে বেড়াতে তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনের সদর কার্যালয় ভবনে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে গেলেই তিনি তাঁর 'রণেনের' দপ্তরে গিয়ে সেখানে বসে দেখা করে আসতেন। অন্যেরা তাই দেখে মজা করে বলতেন, 'খালি রণেনের সঙ্গেই দেখা করেন, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?'

ভূতেশানন্দজী মহারাজের প্রতি রণেন মহারাজেরও শ্রদ্ধার পরিসীমা ছিল না। সারদাপীঠে থাকার সময় তিনি ব্রহ্মচারীদের ক্লাস নিতেন। অনেক দিন সেই সময় পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীকে তাঁর সেবকরা নিয়ে আসতেন সারদাপীঠে মায়ের মন্দিরের সামনে। শিবময়ানন্দজী তখন ক্লাস ছেড়ে দিতেন, আর সকলে প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণাম করতেন। ভূতেশানন্দজী একদিন বললেন, 'কী হে রণেন, ছেলেদের ছেড়ে দিলে কেন?' শিবময়ানন্দজী বললেন, 'আপনি সঙ্ঘগুরু এসেছেন, আর কী পড়া!' ভূতেশানন্দজী বলেন, 'বাপু তাহলে আর আসব না।' শিবময়ানন্দজী বললেন, 'না না মহারাজ, আপনি স্বচ্ছন্দে আসবেন, আপনি চলে যাওয়ার পর আমরা আবার পড়ব।' তাতে ভূতেশানন্দজী খুব খুশী। কখনো কখনো সারদাপীঠের সব সাধু-ব্রহ্মচারীরা সারদাপীঠের অডিটোরিয়ামের কাছে একটা গাছতলায় বসতেন, ভূতেশানন্দজীও গাছের তলাতেই বসতেন। একদিন এইরকম গাছতলায় বসে ভূতেশানন্দজী বলেছিলেন, 'বুঝলে রণেন, এই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন্ যুগের এইরকম সাধুদের মাঝে বসে আছি আর শাস্ত্রচর্চা চলছে।' শিবময়ানন্দজী বলেন, 'আপনাকে দেখে যেন মনে হয় পুরাতন ঋষি আর আমরা আপনার শিষ্য।'

আর ছিল তাঁর মহাপ্রাণতা। তাঁর এই মহাপ্রাণতার আস্বাদে ধন্য হয়েছেন সাধু ও ভক্ত উভয়েই। যে সাধু কোথাও কোনভাবে টিঁকতে পারছে না, তাকে সযত্নে আশ্রয় দিতেন। কোন অপরাধ করলে সাধুদের তিনি শেষ অবধি সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই তাঁর আশেপাশে এসে জুটতো 'মাথাগরমের দল'। তাদের পরম মমতায় তিনি ঘিরে রাখতেন। অবশ্য কখনো কখনো তাঁকে অসুবিধা ভোগ করতে হত – কিন্তু তিনি তাতে পিছপা হন নি।

ভাবপ্রচার কার্যালয়ে একটি মাদুর রাখা ছিল এক যুবকের জন্য। গরমের দিনে সে মহারাজের সঙ্গে দেখা করার পর প্রসাদ পেয়ে মাদুরটি পেতে শুয়ে বিশ্রামান্তে বাড়ি যেত। কত জন যে নিত্য তাঁর কাছে আসত আর্থিক সাহায্যের জন্য, মানসিক শান্তির জন্য – তার ইয়ত্তা নাই। বিশেষ করে যারা নানাভাবে বিপর্যস্ত তাদের জন্য তাঁর দরজা অবারিত। উনি নিজেই একদিন বলছিলেন, 'পাগলরা কি করে আমার খোঁজ পায় বলত?'

মহারাজের এই ভালোবাসার টানে যাদের প্রতি কেউ কখনো ফিরে তাকায়নি, তারা সবাই মহারাজের কাছে আশ্রয় পেত। বেলুড় মঠে সদর কার্যালয়ে শিবময়ানন্দজীর অফিসঘরে বসে কেউ একেবারে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে গান গাইছে, "জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস মা, শ্যামা মা তুই জেলের মেয়ে"। এই ঘটনা কয়েকদিন ধরেই হচ্ছিল। এক গায়ক আসছিলেন এবং তিনি প্রাণের সুখে গান গাইছিলেন এবং সেদিকে পাত্তা না দিয়ে শিবময়ানন্দজী বসে বসে লেখাপড়া, তাঁর যে কাজগুলো করতেন। এতদিন অবধি সেটা সহ্যের মধ্যে ছিল, সেদিনকে একেবারে অসহ্য হয়ে গিয়েছে। পাশের অফিসের অত্যন্ত বয়ঃকনিষ্ঠ এক মহারাজ আস্তে আস্তে যাচ্ছেন মহারাজের ঘরে গিয়ে বলবেন বলে। তাঁকে ঘর অবধি যেতে হল না, শুনতে পেলেন ভেতর থেকে মহারাজ বলছেন, 'রেডিওর volume-টা একটু কমাতে হবে, পর্দার তলা দিয়ে গেরুয়া কাপড় দেখা যাচ্ছে।' বোঝা গেল, সেই সন্ন্যাসীর উপস্থিতি বুঝে ফেলেছেন। অতএব তাঁকে অভিযোগ না জানিয়েই ফিরে আসতে হল।

একসময় বেলুড় মঠের জনৈক সাধু কয়েক বছর ধরে বেশ একটু মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই সাধুর পড়াশুনোর প্রতি আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন সময় রণেন মহারাজ যথারীতি তাঁর খোঁজখবর নিতেন, তিনি কী পড়ছেন জানতে চাইতেন। এমনকি, সে ধরনের বই দিয়েও সহায়তা করতেন এবং তাঁর নানা কথা, আলোচনা মন দিয়ে শুনতেন। একবার মহারাষ্ট্র ভাবপ্রচার পরিষদের সম্মেলনের জন্য কোলাপুর থেকে মহারাজের কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল। মহারাজ জানতেন, সেইদিকেই ঐ সাধুটির পূর্বাশ্রম। মহারাজ তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সেসময় অনেক ভক্ত ঐ সাধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন – তারমধ্যে তাঁর পূর্বাশ্রমের কয়েকজন আত্মীয়ও ছিলেন। পূর্বাশ্রমের ঐসব পরিচিত জায়গা ঘুরে এবং পরিচিত পরিজনদের দেখে সাধুটি মানসিক শান্তি লাভ করেছিলেন।

তাঁর দরদ কেমন সর্বত্র প্রসারিত তা দেখা যেত সেবাপ্রতিষ্ঠানে গেলে। তিনি বেলুড় মঠ বা কলকাতা যে-কোন জায়গা থেকেই নিয়মিত সেবাপ্রতিষ্ঠানে অসুস্থ সাধু ও ভক্তদের খোঁজ নিতেন এবং দেখতে যেতেন। যদি দেখতেন যে রোগী ঘুমোচ্ছে, অন্যদের তার রোগ ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন। কেউ যদি জবাব না দিতে পারত দুঃখ পেয়ে বলতেন, 'তুমি একই ঘরে আছ আর তোমার ভাইয়ের কি হয়েছে, কেমন আছে – তা জানো না?'

রহড়ায় তাঁর চেয়ে বহু কনিষ্ঠ এক ব্রহ্মচারী তাঁর সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন। ব্রহ্মচারীটি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শিবময়ানন্দজী নিজেই তাঁর জামা-কাপড় কাচা, খাবার নিয়ে আসা প্রভৃতি কাজ হাসিমুখে করছেন দেখে তাঁর চোখে জল এল। তা দেখে মহারাজ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এ নিয়ে কিছু ভেবো না। তুমি এখন অসুস্থ। তোমার করার সামর্থ্য নেই। কাউকে তো করতে হবে।'

মহারাজের ভালবাসা নানা রূপে প্রকাশ পেত। রহড়াতে আইনি সাহায্যের জন্য কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে সারারাত জেগে আদালতের দলিল তৈরি ইত্যাদি করতে হত। মহারাজ সারাদিন কলেজে অশেষ মানসিক চাপ সহ্য করে তারপর এই ব্রহ্মচারীদের সঙ্গ দিয়ে রাত জাগতেন। তাঁকে শুতে যেতে বললেও তিনি শুনতেন

না; বলতেন, ব্রহ্মচারীরা যখন তাঁকে সাহায্যের জন্যই কাজ করছে, তাঁর পক্ষে তাদের ফেলে শুতে যাওয়া অনুচিত। ভোরের দিকে তিনি বলতেন, 'এইসব কাগজপত্র তৈরীতে তো তোমাদের আমি সাহায্য করতে পারব না। আমি বরং এক কাজ করি – আশ্রমের গোশালায় গিয়ে টাটকা দুধ জোগাড় করে তোমাদের ভাল কফি করে খাওয়াই।' এইরকম দু'-একদিন নয় – দিনের পর দিন হয়েছে।

ভাবপ্রচার কার্যালয়ে কর্মরত ছেলেটির প্রতি তাঁর যে কত গভীর ভালবাসা তা তাঁর প্রতিটি কথায় ও কাজে প্রকাশ পেত। যখন ভাবপ্রচার কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব তিনি ছাড়ছেন, তখন কে ঐ অফিসে কাজের জন্য আসছেন জেনে তাঁকে ফোন করে ছেলেটির জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তাকে যেন ওই অফিসেই রাখা হয় এই মর্মে অনুরোধ করেন – স্নেহময় পিতা যেন পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল! কারণ, ছেলেটি যে সবার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। ছেলেটির সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে তাকে ওই অফিসেই রাখা হবে – এ রকম আশ্বাস পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হন। তিনি মঠে থাকাকালে বিভিন্ন সময় তাকে নিয়ে কখনো কখনো তিনি বেলুড়ে বা বালিতে তাঁর পরিচিত কোন বাড়িতে যেতেন। কিছু অর্থ সাহায্য করা বা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখা – এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রায়ই যেতেন টোটোয় চেপে। একবার রেল কোম্পানির চিঠি অনুসারে টিকিটের দাম বাবদ তাঁর প্রাপ্য কিছু টাকা ফেরত আনার জন্য তাকে বেলুড় স্টেশনে পাঠান। বলে দেন ও যেন টোটোয় চেপে যাতায়াত করে। রেল কোম্পানির কাছে পাওয়া গেল কুড়ি টাকা, আর টোটো ভাড়া খরচ হল কুড়ি টাকা!

রহড়া কলেজে থাকার সময় পদার্থবিদ্যা বিভাগের এক কর্মীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কয়েকজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে ফুল-মালা, টাকা-পয়সা নিয়ে হাজির হলেন। ঐ কর্মীর দুই সন্তানের রহড়া আশ্রমে পড়ানোর ব্যবস্থা করে তার পরিবারকে খানিকটা আশ্বস্ত করে শ্মশানে গিয়ে দাহকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে থেকে গঙ্গা স্নানান্তে আশ্রমে ফিরে এলেন। এভাবে বহু গরিব ভক্তদের, বিধবাদের আর্থিক সাহায্য করতেন খুব গোপনে। পারতপক্ষে কেউ জানতে পারত না।

মহারাজ তখন সহাধ্যক্ষ। বেলুড় অঞ্চলে তাঁর পূর্বপরিচিত এক ভক্ত অসুস্থ, মহারাজ তাকে দেখতে যাবেন। সেবক বললেন, 'মহারাজ, তাহলে গাড়ীর ব্যবস্থা করি।' মহারাজ বললেন, 'ওদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়, গাড়ী নিয়ে গেলে স্ট্যাটাস দেখানো হবে। চল, আমরা টোটো করে যাব।' সেভাবেই তাদের বাড়ীতে গেলেন, নিজেই প্লাসটিকের চেয়ার টেনে বসলেন, তাদের খবরাখবর নিলেন, আসার সময় জোর করে কিছু আর্থিক সাহায্যও করে এলেন।

ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক থাকাকালে তিনি পরিষদের অধীন প্রাইভেট আশ্রমগুলির উন্নতির জন্য খুবই পরিশ্রম করেছিলেন। দরদী মন নিয়ে ঐসব আশ্রমের সমস্যা মেটাতেন। তাঁদের খুব সাহায্য করতেন। ঐসব আশ্রমের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘভুক্ত নন এমন অনেক সাধু ছিলেন, তাঁদের তিনি গোপনে আর্থিক সাহায্য করতেন। এমনকি তাঁদের চিকিৎসার ব্যয়ভার তিনি বহন করতেন। বিভিন্ন ভাবপ্রচার আশ্রমের কর্মীদের জন্য তাঁর আন্তরিক ভালবাসা ছিল। একটি আশ্রমের সম্পাদক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফ্রি বেডে

ভর্তি। মহারাজ তাঁকে দেখতে গেলেন এবং তাঁর করুণ দশা দেখে কিছু ফল ও টাকা তাঁর জন্য দিয়ে এলেন।

একবার শিবময়ানন্দজী জনৈক সন্ন্যাসীকে ভাবপ্রচার পরিষদে বেলুড় মঠের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাবার সময় বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'মূলতঃ আমরা এইসব অঞ্চলে কাজ করতে পারিনা বলেই ভক্তেরা এইসব অঞ্চলে ছোট ছোট আশ্রম খুলে কাজগুলো করছে। অতএব, ওদের সেই মর্যাদাই দিবি যে মর্যাদাটা তুই জগতের কাছ থেকে আশা করে থাকিস। ওরা আমাদের প্রতিনিধি, রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করছেন। এটা এক নম্বর। দু' নম্বর হচ্ছে, আমরা আমাদের সমস্ত জীবনটা রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়েছি, খাওয়া-পরার ভার আমাদের সঙ্ঘ নিয়েছেন। কিন্তু ভাবপ্রচার পরিষদে যারা কাজ করছেন তারা তাদের নিজেদের খাওয়া-দাওয়া, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে তবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। সেই কারণে তাদের কাছ থেকে expect করবে না যে তারা আমাদের মতো কাজটা নিখুঁত করবে। কিন্তু একইসঙ্গে প্রতি মুহূর্তে তাদের সাহায্য করতে হবে, কেমন করে তারা নিজেদের upgrade করতে পারবে। এটা কেন হল না, ওটা কেন হল না, এটা কেন করেননি – এই জাতীয় খিচখিচ কথা বলবে না।'

ভাবপ্রচার পরিষদের সম্মেলনে তিনটি জিনিসের ওপর তিনি খুব জোর দিতে বলতেন – যুবকদের সঙ্গে সংযোগ, পাঠচক্রের মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে সংযোগ এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ। তিনি সন্ন্যাসীদের বারবার বলতেন যে, মনে রাখবে আমরা কিন্তু প্রশাসক নই, আমরা উপদেষ্টা; আমরা, আমাদের কাজ হচ্ছে পরামর্শ দেওয়া। আমাদের ভালোবেসে সমস্তকিছু করে পরামর্শ দিতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বলতেন, যেখানে ভালোবাসা কাজ হচ্ছে না, সেখানে অবশ্যই শাসন করবে, কিন্তু সেটা ভালোবাসার সঙ্গে যেন হয়। আরেকটা কথা খুব জোর দিয়ে বলতেন, 'তোরা-আমরা গেরুয়া পরে ফেলেছি, আমাদের যাই বয়স হোক না কেন, বুড়ো ভক্তরা আমাদের দেখে একেবারে সপাটে মেঝেতে পড়ে পেন্নাম করবে। তাই বলে নিজেকে পূজনীয় ভাবিস না। যে মানুষজনগুলি কাজ করছেন, তারা প্রত্যেকে আমাদের থেকে বয়সে বড়। ভাবপ্রচার পরিষদে এইসব মানুষজনদের সঙ্গে যখন কথা বলবি, খুব সতর্ক থাকবি।'

একবার ভাবপ্রচার পরিষদের একটি সভায় দেখা গেল কথা কাটাকাটির ফলে তিক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। মহারাজ চা খাবার অবকাশে পরবর্তী অধিবেশনের সন্ন্যাসী-বক্তাকে বললেন, 'তুই তো শেষকালে বলবি, তুই একটা কথা বলতে পারবি? মা বলেছেন – ভালোবাসায় সব হয়, ভালোবাসা আমাদের সঙ্ঘের বন্ধনের মূল কারণ। এই ভাবটা নিয়ে তুই একটু বলতে পারবি? তুই সমস্যার সমাধান তো বলবি, কিন্তু এইটাকে খুব জোর দিবি। পুরনো সাধু যাদের তুই দেখেছিস, যাদের ভালোবাসার আকর্ষণে ঠাকুরের ভালোবাসাকে বুঝতে পেরে তোরা সঙ্ঘে এসেছিস, সেই ভালোবাসাটা এরা কেমন করে একে অপরের ভেতরে ছড়িয়ে দিতে পারবে – এবং সেটা অন্য যুবকদের অনুপ্রাণিত করতে পারে, এই বিষয়ে তুই বল।' বক্তা সেই বিষয়ে বললে তিনি খুশী হন এবং ফেরার সময় গাড়িতে আসতে আসতে মহারাজ বলেছিলেন, 'বুঝলি তো, আমরা ভুলে যাই যে, ভালোবাসা দিলে

বনের পশুও আমাদের বশ হয়ে যায়। আর সেখানে এই মানুষগুলো জ্বালায় ভুগে তো আসে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভরা ঘর-সংসার, সেখানে যদি খুব আনন্দ পেত, তাহলে কি তারা আশ্রমে আসত? তা তো আসত না, সেখানে dissatisfaction আছে বলেই তো শ্রীরামকৃষ্ণকে আঁকড়ে ধরেছে। আর আমরা যদি একটু ভালোবাসা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে নিতে পারি, তাহলে কত সুবিধে হয়!'

ভাবপ্রচারের একটি সভায় যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'এই উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশুনা করবে যাতে এর দ্বারা শুধু নিজের নয় পরের উপকার করতে পারো। তবেই পড়াশুনা পূজা হয়ে উঠবে।' ভক্তদের উদ্দেশ্যে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, 'আমাদের বরণ করতে হবে ক্রিয়াশীল আধ্যাত্মিকতা। আমরা অবশ্যই চোখ বন্ধ করে ধ্যান করব, কিন্তু যে ভগবান সবার মধ্যে বিরাজমান, চোখ খুলে রেখে তাঁর ধ্যান করব। নিরক্ষরদের মধ্যে ঈশ্বরের পূজা হবে বিদ্যাদান, দরিদ্রদের মধ্যে প্রভুর পূজা হবে দারিদ্র্য দূর করে আর রোগীদের মধ্যে ভগবানের সেবা হবে তাদের শুশ্রূষা করে।'

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর জন্মস্থান গুড়াপ আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি ও অধিগ্রহণের পিছনে তাঁর অবদান ছিল। মহারাজ সেখানকার অধ্যক্ষকে একদিন বলেন, 'দেখ, পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের স্মৃতিকথা নিয়ে একটি পত্রিকা ছাপাও।' বেশ কিছু গুরুভাই-বোনদের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। তারপর তিনিই প্রুফ দেখার ব্যবস্থা করে দিলে গুড়াপ আশ্রম থেকে 'প্রপত্তি' নামে পত্রিকাটি ২০১৭ সালে প্রকাশ পেল।

তিনি সঙ্ঘের ঐতিহ্যকে মান্য করতেন। যে কোন সাধুর দাহকার্যের সময় তিনি হাজির থাকবেনই। বেলুড় মঠে দাহকার্যের সময় নানা গান গাওয়া হয়। সেগুলি উৎসাহের সাথে গাইতেন, শেষ পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতেন। যখন বেলুড় মঠের বাইরে কলকাতায় ছিলেন, দাহকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক সন্ন্যাসীকে মৌখিক নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, কোন সাধুর দাহের খবর হলেই যেন তাঁকে জানানো হয়। খবর পেলেই চলে আসতেন। একবার কোন কারণে এক সাধুর দাহ বেলুড় মঠে না হয়ে কাশীপুরে হবে। কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী গেছেন কাশীপুর শ্মশানে। তাঁরা দেখেন একটু পরে মহারাজ এসে হাজির। বললেন, 'বুঝলি রে, এই সাধুটি আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।' এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর প্রিয়-অপ্রিয়ের কথা অবান্তর কারণ তিনি সকল সাধুর দেহের দাহকার্যে উপস্থিত থাকতেন – নবীন বা প্রবীণ যেই হোন। সেদিন তিনি সেখানে মাটিতে বসে পড়লেন এবং কেউ ভাল গাইয়ে না থাকায় নিজেই অগ্রণী হয়ে ভজন গাইতে লাগলেন যতক্ষণ না সব শেষ হয়।

সঙ্ঘগুরুকে গুরুবৎ সম্মান সঙ্ঘের ঐতিহ্য। একবার সারদাপীঠের শিল্পমন্দিরে এক অনুষ্ঠানে সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও শিবময়ানন্দজী উপস্থিত আছেন। অনুষ্ঠানের পর সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ সোফায় বসে আছেন, শিবময়ানন্দজী দূরে চেয়ারে বসে। আত্মস্থানন্দজী মহারাজ বার বার ডাকছেন তাঁর পাশে বসার জন্য, শিবময়ানন্দজী রাজী নন। বললেন, 'বড়দের কাছে শুনেছি যে, সঙ্ঘাধ্যক্ষের সঙ্গে একাসনে বসতে নেই।'

সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর ছিল শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক। বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের সঙ্গে তো তাঁর ছিল বিশেষ ভালবাসার সম্পর্ক। সারদাপীঠে ও বেলুড় মঠে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। শিবময়ানন্দজীর সম্বন্ধে সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন, 'ওর মধ্যে লক্ষ্য করেছি সাধুসুলভ মনোভাব, নিরভিমানিতা এবং অপরের জন্য দরদ।'

স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ, স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ প্রভৃতি বর্ষীয়ান সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ছিল তাঁর আন্তরিক সুমধুর সম্পর্ক। এঁদের সঙ্গে তিনি সারগাছি, সারদাপীঠ বা বেলুড় মঠে বিভিন্ন সময়ে, নানা ভাবে একসঙ্গে কাজ করেছেন। প্রীতি, শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁদের সম্বন্ধ। তাঁরা শিবময়ানন্দজীর শেষ অসুখের সময় তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আন্তরিক উদ্বিগ্ন হয়েছেন, নিয়মিত খবর নিয়েছেন সেবাপ্রতিষ্ঠানে এবং মহারাজের নিরভিমানিতা, বেদাগ সাধুজীবন, অসীম সহ্যশক্তি ও সাধুদের প্রতি অগাধ দরদের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।

মহারাজ শেষ অবধি তিনি নিজেকে সাধারণ এক সাধু ভাবতেন। তাঁর থেকে অনেক ছোট সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে মিশে তিনি বসে থাকতেন – জপ-ধ্যানের সময়ই হোক বা সমবেত ভজনের সময়ই হোক। তিনি যখন দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেছেন, তখন একদিন সরলভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, 'কী ব্যাপার বলত – সবাই আজকাল আমাকে এত খাতির করছে কেন?' এই সরলতা ও নিরভিমানিতাই তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। এক অধ্যাপক – যিনি কট্টর মার্ক্সবাদী বলে পরিচিত ছিলেন, তিনি নাকি বলেছিলেন, 'যস্মাদ্ নোদ্বিজতে লোকঃ ইত্যাদি শ্লোকটি পূজনীয় শিবময়ানন্দজীর জীবনে রূপায়িত হয়েছে।'

তাঁর নিরভিমানতা প্রকাশ পেত তাঁর প্রতিটি ব্যবহারে। রহড়াতে প্রচণ্ড গোলমালের সময় তাঁর মানসিক চাপ দেখে তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট এক ব্রহ্মচারী তাঁকে উপদেশের ভঙ্গীতে বলেন, ঠাকুরের কাছে সরলভাবে কাঁদলে সব সমস্যারই সমাধান পাওয়া যায়। বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়ে মহারাজ বলে ওঠেন, 'ঠিক বলেছিস, আমি তাই করব। দেখি ঠাকুর কি করেন।'

মহারাজ তখন মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ। পাটনায় এসেছেন। একদিন ভোরবেলায় মহারাজ সেখানকার দেবীপীঠ পাটনিদেবী দর্শন করতে গেছেন। মন্দিরে তখন মঙ্গলারতি হচ্ছে। আশ্রমের অধ্যক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে মহারাজ সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পান। মহারাজ সামনে দাঁড়ালেন কিন্তু যখনই দেখলেন যে তাঁর পিছনে যারা আছেন তাদের অসুবিধা হতে পারে, তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। মহারাজ দেখেন একজন মন্দিরের জমা জল বের করে পরিষ্কার করছে। মহারাজ তার হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে মন্দির পরিষ্কার করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহারাজের ভাবটি এই, তিনি মা জগদম্বার সেবক এবং এই কাজ করে তিনি দর্শনার্থীদের সুবিধা করে দিচ্ছেন।

আবার ভুল করলে ভুল স্বীকার করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। একবার তাঁর প্রিয় বয়ঃকনিষ্ঠ এক সন্ন্যাসীকে একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের জন্য খুব বকতে থাকেন। সন্ন্যাসীটি সব শুনে আবেগভরে বলে ওঠেন যে তিনি স্বামীজীর স্বপ্ন সফল করারই

চেষ্টা করছেন এবং মহারাজের মতো প্রবীণ সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদই তাঁর সম্বল। শুনে মহারাজও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ও তাঁকে আশীর্বাদ করেন। সব কাজ শেষ করে সন্ন্যাসীটি বেরিয়ে আসছেন, মহারাজ বলে ওঠেন, 'তোকে বড্ড আঘাত দিয়ে ফেলেছি না, খুব কষ্ট পেয়েছিস না, বল।' সন্ন্যাসীটি তাঁকে আশ্বস্ত করলে মহারাজ নিশ্চিন্ত হন।

বিভিন্ন সময়ে মহারাজ পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। বহু জায়গায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছোট কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পরিণত বয়সেও এই অভ্যাস ত্যাগ করেন নি। একবার তাঁর পরিচিত 'মিত্র' পদবীধারী এক ভক্তকে নিয়ে ছড়া লেখেন – 'যে ধন পেলে আর কোন ধন/ ভাল নাহি লাগে,/ তার চেয়ে আর কোন সুখই/ মনে নাহি জাগে;/ যা পেলে আর কোন কষ্ট/ কষ্ট নাহি দেয়,/ তারই লোভে 'খেপা' মিত্র/ বেলুড় মুখো রয়!/ এমন সুজন পেলে প্রভু,/ তার পিছনে ঘোরে,/ সুজন ভাবে 'আমি খুঁজি',/ তিনি সুজনেরে।/ লুকোচুরি খোঁজাখুঁজি/ 'বুড়ি ছোঁয়ার' খেলা,/ মিত্র বলে 'দিন ফুরালো,/ দাও দেখা এই বেলা!'

প্রকৃতপক্ষে মহারাজের অধ্যয়ন ছিল অসাধারণ। অঙ্কের ছাত্র হয়েও তিনি ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দী সাহিত্য, দর্শন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতির গভীর চর্চা করেছিলেন। যোগোদ্যানে একবার মহারাজ গ্রন্থাগারের দায়িত্বে থাকা ব্রহ্মচারীকে রবীন্দ্র রচনাবলীর বেশ কয়েকটি খণ্ড নিয়ে এসে 'ধর্ম' নামক প্রবন্ধের 'শান্তিনিকেতন' অংশটি খুঁজে দিতে বলেন। কয়েকদিন পরে তিনি ব্রহ্মচারীটিকে ডেকে রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা নির্দিষ্ট অংশ খুলে তাকে জোরে জোরে পড়তে বলেন। অংশটি ছিল, রবীন্দ্রনাথ পত্রের রূপকে পুরাতন ও নবীনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। মহারাজ শুনতে শুনতে হেসে কিছু মন্তব্য করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পড়ার পরে মহারাজ তাকে বলেন, 'তুই এটা নিয়ে যা, পড়বি ও পরে আমাকে বলবি।'

একই ভাবে গানেও তাঁর খুব আগ্রহ। তবে গানের সুরের চাইতে গানের কথা ও ভাবের প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর খুব পছন্দের। বর্তমানে এক সুগায়ক সন্ন্যাসী, তখন কলেজের তরুণকে তিনি দু-চারটি গান আলাদা করে শুনতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল – 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন'। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতাটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, মুখস্থও ছিল। নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতির গানও তাঁর খুব প্রিয় ছিল এবং মুখস্থও বলতে পারতেন বহু কবিতা ও গান। কখনো কোন গান বা কবিতার একটি কলি বলে পরের কলিটি জানতে চাইতেন।

আবার রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গাওয়া গানেও তাঁর ছিল সমান আগ্রহ। আগমনী, কালীকীর্তন, ঊষাকীর্তনের যে মহড়া বেলুড় মঠে হত, তাতে তিনি মাঝে মাঝেই যেতেন। মন্দিরে কালীকীর্তন বা অন্যান্য ভজনেও তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল না – গানও মুখস্থ থাকত। কালীকীর্তনে 'নীলবরণী নবীনা রমণী' গানটি খুবই পছন্দ করতেন। মহড়ার সময় এমনও হয়েছে, একবার হয়ত গানটা গাওয়া হয়েছে, মহারাজ একটু দেরিতে ঢুকেছেন। এসেই বললেন, 'ঐ গানটা কর তো, সবকটা

লাইন 'নী' দিয়ে শুরু।' মহারাজের প্রিয় গানগুলি মধ্যে ছিল ভক্ত দেবী সহায়ের 'অব শিব পার করো মেরে নেইয়া' এবং রামপ্রসাদের 'মা আমায় ঘুরাবি কত'। শেষ অসুখের কয়েকদিন আগে এক স্নেহভাজন কনিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে ফোন করে বলছেন, 'ঐ গানটা গা তো – ভয় কি রে ভাই।' সন্ন্যাসীটি ফোনেই গাইতে আরম্ভ করলে বলে ওঠেন, 'দাঁড়া, আমিও গাই।' বলে তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফোনেই গানটি করলেন।

মহারাজের জীবনচর্যা ছিল খুবই সাদাসিধে। নিজের চা খাওয়ার কাপ-প্লেট ধোয়ার জন্য কারোর হাতে দিতে চাইতেন না। অনেকসময় দেখা গেছে ভক্তদের সঙ্গে কথাবলার সময় তিনি চেয়ার থেকে নেমে মেঝেতে বসে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। ভক্তেরা কেউ কিছু খাবার জিনিস নিয়ে আসলে, তিনি একটুখানি তার থেকে নিয়ে বাকিটা সামনে যারা আছে তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে বলতেন। পায়ের নিচে কুশন বা গদি বেশীরভাগ সময় দিতে দিতেন না। তাঁর নিজের জুতো কেউ হাতে করে এগিয়ে দিক, তিনি একদমই চাইতেন না।

বৃথা সময় নষ্ট কোনকালেই করতেন না। তিনি বেশীরভাগ সময়ই কোন না কোন উচ্চ চিন্তা বা ভাবে থাকতেন। যখন তিনি কোন বই, কবিতা, মন্ত্র পড়তেন বা গান শুনতেন গভীরভাবে তার অর্থ চিন্তা করতেন। মহারাজকে ভক্তদের প্রণামের সময়, কাউকে তিনি বই দিয়ে পাঠ করতে বলতেন, যেন প্রণামটা গৌণ আর পাঠটাই হল মুখ্য। মাঝে মাঝে তিনি কি পাঠ হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতেন অথবা পাঠের বিষয়বস্তু সরলভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

শিবের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ টান ছিল। প্রতি সোমবার তিনি শিব পূজা করতে ভালবাসতেন। একবার স্বামীজীর বাড়ি থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসী-সহ মহারাজ বেলুড়মঠে কোন এক অনুষ্ঠানে আসছেন, বালিতে এসে বেলপাতা গঙ্গাজল কিনে কল্যাণেশ্বর শিবের পূজা করে মঠে গেলেন। সহকারী সম্পাদক হয়ে বেলুড় মঠে থাকতেও অনেক সময় সকলের অজ্ঞাতসারে হেঁটে বা বাসে চলে যেতেন বালিতে কল্যাণেশ্বর শিবদর্শনে। একবার বাস থেকে পড়ে পায়ে চোট লাগে। তাতেই অন্যেরা তাঁর এই অভ্যাসের কথা টের পায়।

সহাধ্যক্ষ হবার পরেও মহারাজের প্রতি সোমবার শিবমন্দিরে যেতেন। সেবককে সঙ্গে নিয়ে শিবমহিম্নস্তোত্রম্, বিশ্বনাথাষ্টকম্, শিবাষ্টকম্, শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্ ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করতে করতে হেঁটে হেঁটে কাছাকাছি শিবমন্দিরে গিয়ে শিবপূজা করতেন। পূজার উপকরণ ছিল গঙ্গাজল, বেলপাতা, অল্প কিছু ফুল আর ধূপ। ফিরতেন শিবনাম সঙ্কীর্তন করতে করতে।

মহারাজ নিজে স্বাবলম্বী থাকা পছন্দ করতেন এবং এভাবটি তিনি শেষ অবধি বজায় রেখেছিলেন। কখনই চট করে সেবকদের সাহায্য নিতে চাইতেন না। যোগোদ্যানে মহারাজের ঘরে সেবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীসেবকটিকে ব্যক্তিগত কাজ করতে দিতে চাইতেন না। নিজেই বাথরুমের জল ওয়াইপার দিয়ে পরিষ্কার করতেন, বেশীরভাগ দিনই নিজের কাপড়-জামা নিজেই ধুয়ে স্নানের পর ধোয়া কাপড়গুলি নিজে হাতে রোদে শুকোতে দিতেন। কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে গেলে তার কপালে জুটত ধমক বা বলতেন, 'আমি কি তোকে করতে বলেছি?'

একদিন দুপুরে মন্দির থেকে মহারাজের বেরনোর সময় বৃষ্টি পড়ছে দেখে সেবক ছাতা নিয়ে উপস্থিত হলে মহারাজ বলে ওঠেন, 'তুমি Guardian-গিরি করতে এসেছ!'

মহারাজ পশুপাখী, জীবজন্তু খুব ভালবাসতেন। আগে মহারাজের দুটি পোষা কুকুর ছিল। কাঁকুড়গাছিতে যখন ছিলেন তখন সেখানকার রাজহাঁসগুলিকে খুব ভালবাসতেন। কখনও কখনও তাদের জন্য ঘাস এনে খাইয়েছেন। কাশীপুরেও খুব প্রিয় ছিল এখানকার পশুপাখীগুলি। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন বিভিন্ন পাখীর ডাক তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও তারা কি বলতে চাইছে বোঝার চেষ্টা করতেন, সেবককে কখনও কখনও এসব বিষয়ে বলেছেন।

জপ-ধ্যান, সন্ধ্যারতি ও মঙ্গলারতিতে তাঁর নিষ্ঠা অনুকরণীয়। দীক্ষাগুরু হওয়ার পর বা সহাধ্যক্ষ পদে বৃত হয়েও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। প্রতিদিন নিয়ম করে সন্ধ্যারতি ও মঙ্গলারতিতে যেতেন। ২০২০ সালের মে মাসে আমফান ঘূর্ণিঝড় হয়। দুপুর থেকেই প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। এরই মধ্যে সন্ধ্যারতির আগে মহারাজ নিজেই ছাতা নিয়ে আরতিতে যোগ দিতে বেরিয়ে পড়েন। মহারাজের বাসস্থান ও মন্দিরের মধ্যে বেশী দূরত্ব না থাকলেও প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিতে মহারাজের জামা গেঞ্জি ভিজে গেল। নির্বিকার মহারাজ ঐ অবস্থাতেই তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে জপ করতে লাগলেন। পরে আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ মন্দিরে এসে মহারাজের অবস্থা দেখে জনৈক সাধুকে দিয়ে মহারাজের ঘর থেকে শুকনো পোশাক এনে দিলে মহারাজ মন্দিরের মধ্যেই তা পরিবর্তন করে নেন।

মহারাজ তখন যোগোদ্যানে আছেন। লকডাউনের জন্য আশ্রম বন্ধ থাকার দরুণ মহারাজ এই সময় প্রায় প্রতিদিন সকাল সাড়ে দশটা-এগারোটা নাগাদ নাটমন্দিরে বা দোতলায় মায়ের ঘরে এসে জপ করতেন। একদিন মহারাজ নাটমন্দিরে জপ করছেন। নির্দিষ্ট সময় ঠাকুরের ভোগ নেমে যাওয়ার পর গর্ভগৃহের দরজা খোলা হয়, আবার ঠাকুরের শয়নের জন্য মন্দির বন্ধও হয়ে যায়। সেদিন নাটমন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও মহারাজ তা জানতে পারেননি। তন্ময় হয়ে জপ করছেন। এদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী বা পূজারী মহারাজ প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছে কিন্তু কেউ সাহস পাচ্ছে না মহারাজকে ডাকার। অবশেষে সেবক মহারাজ এসে মহারাজকে ঘরে নিয়ে যান।

মহারাজের রসবোধ ছিল অসাধারণ। বেলুড় মঠে কালীকীর্তনের মহড়ায় তিনি হাজির। গান হচ্ছে – 'ক্ষ্যাপার হাটবাজার'। সেখানে উপস্থিত একজন সন্ন্যাসী একটু ছিটগ্রস্ত, কোমরে উত্তরীয় জড়িয়ে দু'হাত তুলে নাচতে আরম্ভ করেছেন। যখন গাওয়া হচ্ছে 'তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে কেউ মাথায় চড়িস তার'। মহারাজ মৃদু হেসে সন্ন্যাসীটিকে দেখিয়ে মৃদুস্বরে বলছেন, 'দুই সতীনের এক সতীন নাচছে, আর এক সতীন কোথায়?'

মহারাজ অনেক সময়ই সাধু-ব্রহ্মচারীদের নাম মনে রাখতে পারতেন না, বলতেন 'এই ছেলে'। এই ডাকটি নিয়ে খুব মজা হত। অনেক সময় বয়স্ক সন্ন্যাসীদের (অবশ্য তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট) এবং কম বয়সীদের তিনি 'এই ছেলে' বলেই ডাকতেন। একজন সিনিয়র মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, 'এদের "এই ছেলে"

বলছেন, আর আমাদেরও "এই ছেলে" বলছেন। আমাদের যদি "এই ছেলে" বলেন তাহলে ওদের "এই বালক" বলুন, তাহলে অন্তত পার্থক্যটা বোঝা যায়!' নাম মনে থাকত না বলে সাধুদের অদ্ভুত অদ্ভুত নাম ধরে ডাকতেন। বলতেন, ওই শ্মশানে গান গায় ওই সাধুটিকে ডাক।

মাঝে মাঝে ভাববাচ্যে কথা বলতে ভালবাসতেন। হয়ত গান গাওয়ার ফরমাইশ করছেন, 'সেই গানটিকে গাওয়া হোক।' তাঁর কাছে মিষ্টি এসেছে, ডেকে বলেছেন, 'ঐখানে মিষ্টান্ন আছে, গ্রহণ করা হোক এবং তারপরে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করা হোক।'

বেলুড় মঠে সদর কার্যালয়ে সাধুরা সকালে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি করতেন। কয়েকদিন পরে কি কারণে মন্ত্রপাঠের স্থান পরিবর্তন করা হল। দ্বিতীয় দিনে মহারাজ হঠাৎ তাদের জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'কী ব্যাপার বল দেখি? এতদিন ধরে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণটা আমার ডান কান দিয়ে ঢুকত, এখন বাঁ কান দিয়ে কেন ঢুকছে?' মহারাজের ইচ্ছা বুঝে আবার পুরাতন জায়গায় ফিরে আসা হল। সাধুরা তারপর মাঝে মাঝে মজা করে বলতেন, 'মহারাজ, মন্ত্র ডান কান দিয়ে শোনা যাচ্ছে তো?' মহারাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি হাসতেন।

একদিন এক ভক্ত মহারাজের ঘরে কাজ উপলক্ষে গিয়ে দেখেন মহারাজ কোন একটি কাগজ খুঁজেই যাচ্ছেন। তিনি চুপচাপ বসে থাকতে না পেরে মহারাজকে বললেন, 'মহারাজ আমি খুঁজে দেখব?' মহারাজ হেসে বললেন, 'বয়স হয়েছে তো, সেইজন্য একটি ফাইলের নাম দিয়েছি "Not to forget" – অতি প্রয়োজনীয় কাগজগুলো রাখি। এখন সেই ফাইলটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

তাঁর কাছে ভালবাসার স্পর্শ পেয়েছে এমন মানুষের অভাব নেই। একবার তাঁর কাছে এসেছেন পুরাতন এক ভক্ত, সঙ্গে তাঁর ভাইঝি – সে তখন ডাক্তারি পড়ছে। মেয়েটি তাঁদের খাওয়া কাপ-প্লেটগুলি ধুতে যাবার জন্য এগিয়ে যেতে তিনি বলে উঠলেন, 'এই মেয়ে, তোমাকে ওতে হাত দিতে হবে না। তুমি মেয়ে বলেই কি এটা তোমাকে করতে হবে?' ভক্তটি দেখেন তাঁর ভাইঝির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল ঐ স্বরের মধ্যে যে কি ভালোবাসা লুকিয়ে ছিল যা নাকি ও কোনদিন পায়নি।

মহারাজ তাঁর সেবককে প্রথমেই বলেছিলেন,'দেখ, আমি শারীরিক সেবা বিশেষ চাই না, মানসিক সেবা চাই।' অর্থাৎ সে জপ-ধ্যান, পড়াশুনা, উন্নত জীবন-যাপন করলেই তাঁর আনন্দ। প্রথম প্রথম তাঁর ঘরে সেবক সঙ্কোচ করে অনুমতি নিয়ে ঢুকছে দেখে বলেছিলেন, 'অত জিজ্ঞাসা করে ঘরে ঢোকার দরকার নেই, এমনিই ঢুকবে।'

তাঁর কোন সেবক হয়তো দক্ষিণী খাবার পছন্দ করে, কোথাও গিয়ে তার খাবার অসুবিধা হচ্ছে মনে করলে, ইডলি-ধোসা খুঁজতে নিজেই হয়তো বাইরে বাজারে বেরিয়ে পড়েছেন, এমনও হয়েছে। খুব গরমের সময়, তাঁর ঘর ঠাণ্ডা থাকত বলে, অনেকসময়ই তাঁর ঘরেই সেবককে ঘুমাতে বলতেন ও জোর করতেন; সেক্ষেত্রে অনেক বুদ্ধি করে আবেদন-নিবেদন করে ছাড়া পেতে হত।

শিবময়ানন্দজী ২০১৪ সালে ছ'মাস তপস্যায় কাটান। তারপর তাঁর জীবনে আরম্ভ হল এক নতুন অধ্যায়। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদে তাঁকে ভক্তদের দীক্ষা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। মহারাজ প্রথম দিকে দীক্ষা দিতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি কনখলে কিছুকাল জপ-ধ্যানে কাটান। এরই মধ্যে অসহ্য হার্পিস রোগে আক্রান্ত হন। হার্পিসে কষ্ট পেলেও মুখে তা বড় একটা প্রকাশ করতেন না, তবে শারীরিক ভঙ্গিতে তা বোঝা যেত – বিশেষ করে যারা তাঁকে আগে থেকে জানত।

অবশেষে ৩ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে শিবময়ানন্দজী মহারাজ জয়রামবাটীতে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ২১ জুলাই ২০১৭ তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ পদে বৃত হন। ৩ মে ২০১৭ তিনি বেলুড় মঠ থেকে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে চলে যান; তারপর সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দজী মহারাজের মহাসমাধির পর তাঁর স্থানে মহারাজ কাশীপুর মঠের অধ্যক্ষ হয়ে গত ৭ এপ্রিল ২০২১ সেখানে যান। আদেহান্ত তিনি ঐ পদেই ছিলেন।

তিনি দীক্ষার আগে অন্ততঃ একদিন দীক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করতেন বা আলোচনা করতেন। তখন প্রধানতঃ কতগুলি বিষয়গুলির উপর তিনি জোর দিতেন – 'যত মত তত পথ' আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিকত্ব; শ্রীশ্রীমায়ের কথা, 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা' – আমাদের শ্রীশ্রীমা হলেন 'গণ্ডীভাঙ্গা মা'; স্বামীজীর প্রচারিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ও তার বাস্তবায়ন এবং দীক্ষা নেবার প্রয়োজনীতা।

দীক্ষার আগে দীক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন, 'দীক্ষার আগে গুরু ও শিষ্য উভয়েই পরস্পরকে জানা ও দেখা দরকার।' মহারাজ জানতে চাইতেন দীক্ষার্থীরা ঠাকুর-মা-স্বামীজী সম্পর্কে কতটা অবহিত। এ বিষয়ে দীক্ষার্থীরা প্রস্তুতি না নিয়ে থাকলে, তাদের মনে একটা প্রাথমিক ধারণা করে দিতে চাইতেন।

অনেক সময় দীক্ষায় মহারাজের সময় একটু বেশী লাগত। তার কারণ তিনি প্রত্যেক দীক্ষার্থীর প্রশ্ন বা সংশয় নিরসন না করে ছাড়তেন না। এ বিষয়ে তার কোন বিরক্তি বা কষ্টবোধ ছিল না। তিনি বলতেন, 'জীবনে তো একবারই দীক্ষা নেবে।' দীক্ষার আগে তিনি কিছু খেতেন না। তাই দীক্ষার দিন তাঁর খেতে খেতে কখনও দুপুর ১২/১টা বেজে যেত। দুপুরে যখন দীক্ষার্থীরা প্রসাদ পেতেন, তিনি দেখতে যেতেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, রান্না কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেন। বেশ কয়েকবার এমনও হয়েছে – কোন দীক্ষার্থী হয়তো দীক্ষার স্থানে আসতে অসমর্থ। সেক্ষেত্রে তিনি তার বাড়িতে গিয়ে দীক্ষা দিয়ে এসেছেন।

সঙ্ঘের ধারা অনুসারে তিনি নিজেকে 'গুরু' বলে অহমিকা রাখতেন না। কেউ আশীর্বাদ চাইলে সাধারণতঃ হাত জোড় করে প্রার্থনা করতেন। বিদ্যামন্দিরের তাঁর সহকর্মী কয়েকজন অধ্যাপক তাঁর কাছে দীক্ষা নিলে দীক্ষাদান পর্বশেষে যখন তাঁরা যথারীতি গুরুপ্রণাম করতে যাচ্ছেন, মহারাজ তাঁর আসন ছেড়ে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে সবাইকে অবাক করে 'আমার বন্ধু' 'আমার বন্ধু' বলে ওঠেন।

তিনি দীক্ষার সূত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন। ছোট-বড় প্রাইভেট আশ্রমে

দীক্ষাদি দিতেন। সেবকরা বলত—থাকার বিভিন্ন অসুবিধা। তিনি কিন্তু কোনদিন কোন অসুবিধার কথা বলতেন না। পরিস্থিতি অনুযায়ী মানিয়ে চলতেন। সেবকরা প্রাইভেট আশ্রমে মহারাজের অসুবিধার কথা কর্মকর্তাদের জানাতে চাইলে তিনি তাদের বকাবকি করতেন। বলতেন, 'ওদের ওখানে কেউ যায় না। কাউকে ডাকতে পারে না আর্থিক অসঙ্গতির জন্য। তাই কষ্ট হলেও, অসুবিধা হলেও আমি যাই প্রাইভেট আশ্রমে।' এই সময়ে দীক্ষার সূত্রে তিনি ভারতের বাইরে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। তিনি ভারতেও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে দীক্ষার জন্য গিয়েছেন।

এর মধ্যেই তাঁর শরীর ভাঙতে আরম্ভ হয়েছে। কয়েক বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসনালীর অসুবিধা ও যকৃতের অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাছাড়া মহারাজের দীক্ষার কর্মসূচি একেবারে ঠাসা থাকত। সেবক অনেকবারই বলেছেন, 'মহারাজ একটু বিশ্রাম নিয়ে করলে ভাল।' উত্তরে প্রতিবারই বলেছেন, 'আর তো বড় জোর ২-৩ বছর বাঁচব।'

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ কেরালার কুইলাণ্ডি আশ্রমে তাঁর শেষ দীক্ষাদান। এরপর বিশ্বব্যাপী করোনা-পরিস্থিতির জন্য আর বেরোতে পারেন নি। ততদিনে তিনি ২৯,৪০৪ জন দীক্ষার্থীকে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে সমর্পণ করেছেন।

করোনা আবহে তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হল। কাশীপুরে থাকার সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্র ও ভাবপ্রচারের বহু আশ্রম থেকে আকুল আবেদন আসছে – দীক্ষার্থীদের কৃপা করার জন্য। মহারাজের মন বিচলিত হল - তিনি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য উপেক্ষা করেও ব্যাকুল কিছু দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন।

গত ১৯ মে ২০২১ মহারাজ জ্বর-জ্বর অনুভব করেন, যদিও থার্মোমিটারে জ্বর বোঝা গেল না। ডাক্তারের পরামর্শমতো তাঁর নাড়ি, তাপমাত্রা, রক্তচাপ, অক্সিজেন স্তর সমস্ত মাপা হতে লাগল। পরদিন শরীরে সামান্য বেদনা ও কফবৃদ্ধি দেখা গেলে ডাক্তারের পরামর্শ-অনুযায়ী চিকিৎসা আরম্ভ হল। ২১ তারিখে কয়েকটি পরীক্ষা করা হল, তার মধ্যে কোভিড পরীক্ষাও ছিল। ২২ তারিখে জ্বর দেখা দিল এবং শারীরিক অবস্থার সামান্য অবনতি ঘটলে সেদিন সকালেই তাঁকে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হল। দুপুরের মধ্যে কোভিড পরীক্ষার ফল এলে জানা গেল – মহারাজ কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। সেই মতো ICU-তে তাঁকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করা হল। প্রথমে কয়েকদিন চিকিৎসায় বেশ উন্নতি দেখা গেল। মাঝে মাঝে তাঁকে অক্সিজেন দিতে হচ্ছিল। পরে ২৫ মে থেকে টানা অক্সিজেন দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গুরুতর কোভিড-নিউমোনিয়া হওয়ায় দ্রুত প্রবাহে অক্সিজেন দিয়েও মহারাজের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না দেখে ২৯ মে নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশানে ও পরে ১০ জুন মেকানিকাল ভেন্টিলেশানে রাখা হয়। এর মধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁদের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা করে চলেছেন। ঐ দিনই তাঁর একটা হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় দুপুর ২টা নাগাদ থেকে বাহ্যজ্ঞান হারান।

ICU-তে কোন এক কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একজনকে বলেছিলেন 'জীবন্মুক্তি চাই।' শেষের দিকে কয়েকবার বলেছিলেন, 'আমাকে এবার ছেড়ে দাও'।

৯ জুন রাত্রে ফলহারিণী কালীপূজা। বেলুড়মঠ-সহ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে তখন অমাবস্যাতে কালীপূজা চলেছে। রাত্রে ICU-তে তাঁর কাছে একজন সেবক-কর্মী থাকতেন। নিয়ম অনুসারে তাঁকে মাঝে মাঝে গিয়ে মহারাজের কাছে গিয়ে দেখে আসতে হয়। সে রাত্রে যখন তিনি দূরে বসে আছেন মহারাজের কোন প্রতিক্রিয়া নেই, যেই তিনি নিঃশব্দে মহারাজের কাছাকাছি গেছেন, মহারাজ দু'হাত তুলে তাকে সরে যেতে ইঙ্গিত করছেন। তাঁর চোখ বন্ধ অথচ শব্দহীন পদসঞ্চারে আসা সেবকের উপস্থিতি বুঝে তাকে সরে যেতে ইশারা করছেন – আর মুখে শুধু 'মা' 'মা' শব্দ। এ রকম কয়েকবার। মুখে 'মা'-'মা' ধ্বনি আর সেবক কাছাকাছি যেতেই সরে যাওয়ার ইঙ্গিত।

পরদিন ১০ জুন দুপুরে সেবক দেখেন মহারাজ হাত নাড়ছেন – যেন কিছু চাইছেন। সেবক অনুমান করলেন, মহারাজ যেখানে আছেন, সেখান থেকে ঠাকুরের ছবি দেখা যায় না, হয়ত তিনি ঠাকুরের ছবি দেখতে চাইছেন। তাড়াতাড়ি আইসিইউ-এর এক প্রান্তে টাঙানো শ্রীশ্রীমার বড় একখানি ছবি নামিয়ে এনে মহারাজের সামনে টুলের ওপর রাখা হল। দেখা গেল মহারাজ দু'হাত করজপে নিবদ্ধ – হাতে জপ করে চলেছেন। 'মা, মা' বলে শ্রীশ্রীমায়ের ছবির দিকে তাকালেন, প্রণামের ভঙ্গিতে দু'হাত জোড় করার চেষ্টা করলেন; তারপরেই তাঁর হৃদযন্ত্র বিকল হল, বাহ্যজ্ঞান হারালেন। সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে নানা প্রচেষ্টায় তাঁকে রাখার চেষ্টা শুরু হল – কিন্তু বাহ্যজ্ঞান আর ফিরে এল না। পরদিন, ১১ জুন ২০২১ সারাদিন সমভাবেই কাটল – রাত্রে ৮:৫৯ মিনিটে দেখা গেল মহারাজের নাড়ী রুদ্ধ। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানালেন রাত্রি ৯:০৫ মিনিটে মহারাজ রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেছেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

কোভিডের সরকারি বিধিনিষেধের জন্য মহারাজের পূতদেহ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সেই রাত্রেই ঐতিহাসিক নিমতলা মহাশ্মশানে অগ্নিসমর্পণ করা হয়। সেই রাত্রেই তাঁর দেহাবশেষ বেলুড় মঠে এনে মায়ের ঘাটে গঙ্গায় বিসর্জন করা হল। যে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী বিবিক্তভাবে সারাজীবন চলেছেন, শেষ সময়েও তিনি একাকী বিজনে মিলিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে। গীতার (১৩/১১) 'বিবিক্তদেশসেবিত্বম্-অরতির্জনসংসদি' তিনি সারাজীবন অভ্যাস করেছেন, শেষকালেও তার ব্যতিক্রম হল না। রাতারাতি সকলের অগোচরেই তিনি বিদায় নিলেন।

তাঁর শেষ অসুখ হওয়ার আগেই এক ভক্তের লেখা চিঠির উত্তরে ১৩ মে মহারাজ লিখেছিলেন, 'তোমার 11 May তারিখের mail পেয়ে সুখী হলাম জেনে যে তুমি ভাল আছ। Covid-19 ২য় Wave এ অনেক ভাল ভাল ও অন্তরঙ্গলোক মারা গেল। আমারও শরীর খারাপ হবে চলেও যাবে। তার মধ্যে ঠাকুর ও মাকে ধরে থাকবে, শক্ত করে। তখন সব শোক-তাপের মধ্যেও অবিচল থাকতে পারবে।'

তাঁর মহাসমাধিলাভে শোকপ্রকাশ করে পরদিন ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট জনেরা বার্তা পাঠালেন। অগণিত সন্ন্যাসী ও ভক্তের মনে চিরতরে গাঁথা রইল মহারাজের অমলিন স্মৃতি।

– – –